মাসিক

আল-আবরার

الأبرار

The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৭, সংখ্যা-০১

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ইং, জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৯ হি., মাঘ ১৪২৪ বাং

جمادى الاول ١٤٣٩هـ، فبرائر ٢٠١٨م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৪

পবিত্র সুন্নাহ থেকে :

'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৩৮... ৫

হযরত হারদুয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৭

ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :

খানেকাহের মাসিক ইজতিমায়

উলামায়ে কেরামের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত...... ৮

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :

উলামায়ে কেরাম নবীগণ (আ.)-এর ওয়ারিস........ ১৭

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

সানী জামা'আতের শরয়ী বিধান........................ ২১

মুফতী শরীফুল আজম

রাসূল (সা.)-এর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা-২........... ২৭

আল্লামা ড. শায়খ নূরুদ্দীন

সপ্তম বর্ষে আল-আবরার : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ৩১

মাওলানা কাসেম শরীফ

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩৮

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-১৭............................ ৪১

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

দারুল উলূম দেওবন্দ ও তাবলীগ জামাত

বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৮৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৬ ঈসায়ী সালে। এটি ছিল নববী ইলম শিক্ষা এবং তারবিয়াতী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। যার সূচনা রুহানি নির্দেশনা মতেই ছিল। দারুল উলূম দেওবন্দেরই সন্তান হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী (রহ.) ইসলামী দাওয়াতের চেরাগ নবোদ্দমে-নতুন আঙ্গিকে রৌশন করেন ১৯২৬ ঈসায়ী সালে। তাও ছিল রুহানি নির্দেশনার মাধ্যমে। উলামায়ে কেরামের বিশাল কোরবানী এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টায় এটি একসময় তাবলীগি জামাত হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। যদিও এটি কোনো সংগঠন ও সংস্থা নয়, কিন্তু উলামায়ে কেরাম এই কাজের জন্য এমন কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করেন, যার ওপর পরিচালিত হয়ে সারা দুনিয়াতেই এটি একই ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সর্ববৃহৎ ঐক্যের রূপ নেয়।

এই মেহনতের উদ্দেশ্য ছিল দারুল উলূম যেমন তালিবে ইলমদের মাঝে ইলমে নববী ও নববী তারবিয়াত শিক্ষা দেবে, তেমনি সাধারণ মুসলমানগণও যেন উলামায়ে কেরামের সংস্পর্শ পেয়ে দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে উৎসাহিত হয়, দ্বীনি আমল ও তারবিয়াতের প্রতি অনুপ্রাণিত হয় এবং তাদের ঈমান আমল দুরস্ত হয়।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ছিলেন হযরতুল আল্লাম মাওলানা রশীদ আহমদ গুঙ্গুহী (রহ.) এবং হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)-এর কাছে আধ্যাত্মিক দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। আর ইলমে হাদীস শিক্ষা ও সনদ লাভ করেন শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.) এবং মাওলানা ইয়াহয়া সাহেব (রহ.) হতে।

তাঁর চিন্তাধারা ছিল সমাজ সংস্কারে প্রথম কাজ হবে, তাদের মধ্যে দ্বীনি ইলমের প্রচার ঘটানো এবং শরয়ী বিধানাবলি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা দূরীকরণ। সে কারণে তিনি মেওয়াতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঘরে ঘরে গিয়ে মুসলমানদের সন্তানদের ডেকে এনে মাদরাসায় ভর্তি করাতেন। অতঃপর তিনি জনসাধারণকে দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করা এবং তাদের দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আরম্ভ করেন। একসময় এই কাজের মেহনত মেওয়াত ছাড়িয়ে যায়। তখন তিনি ছুটে যান উলামা হযরাতদের কাছে। যাঁরা তাঁর উস্তাদ ও মুরব্বি ছিলেন তাঁদের কাছে। আরজি পেশ করেন এই কাজের তত্ত্বাবধান গ্রহণ করার। কারণ তিনি মনে করতেন, এই দাওয়াতী কাজে সব সময় আলেমদের তত্ত্বাবধান থাকতে হবে। যদি আলেমদের তত্ত্বাবধান না থাকে তবে এই কাজ হবে অন্তঃসার শূন্য।

এই উদ্দেশ্য হাসিলে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) সর্বক্ষণ দারুল উলূম দেওবন্দ ও সাহারানপুর মাদরাসার তত্ত্বাবধানে কাজ করার পথ বেছে নেন। যেকোনো বিষয়ে তৎকালীন উলামায়ে কেরামকে উপদেষ্টা হিসেবে মেনে নিতেন তিনি। তিনি যাঁদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব উলামায়ে কেরাম। যেমন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.), হযরত মাওলানা সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.), হযরত মাওলানা কারী তৈয়ব সাহেব (রহ.) সাবেক মুহতামিম দারুল উলূম দেওবন্দ, হযরত মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ (রহ.), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), হযরত মাওলানা আব্দুর রব কান্ধলভী (রহ.), হযরত মাওলানা আব্দুল লতীফ (রহ.) শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান মোজাহের উলূম সাহারানপুর মাদরাসা, মাওলানা এযায আলী (রহ.) উস্তাদ দারুল উলূম দেওবন্দ, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) প্রমুখ। (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মাওলানা আবুল হাসানা আলী নদভী (রহ.) লিখিত হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) আওর উনকি দ্বীনি দাওয়াত নামক কিতাব পাঠ করা যায়)।

এরূপ নীতি-আদর্শ ও শরয়ী পদ্ধতি অনুসরণের ভিত্তিতেই মূলত তাবলীগ জামাত আজ সারা দুনিয়ায় তাদের দাওয়াতী মেহনত ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের যে প্রান্তেই দেওবন্দের তা'লীম ও তারবিয়াতের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানেই দেওবন্দের দ্বিতীয় কর্মসূচি তাবলীগে দ্বীনের কিরণ বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বহুকাল থেকেই দারুল উলূম দেওবন্দ এবং তাবলীগ জামাতের এই বিস্ময়কর খেদমতে বাতিলপন্থীরা যেমন ঈর্ষার দাবানলে জ্বলছিল, তেমনি এই ক্ষিপ্রগতির যাত্রাকে রুখে দেওয়ার জন্য নানা ফন্দি-ফিকিরে ব্যস্ত ছিল। কেউ প্রকাশ্যে কেউ বা আড়াল-আবডালে দারুল উলূম দেওবন্দ এবং তাবলীগ জামাতের বিরুদ্ধে রব তুলতে দেখা গেছে বহু আগে থেকেই। কেউ দারুল উলূম দেওবন্দের আদলে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে তাদের নিজেদের চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, কেউ বা নিজেরাই তাবলীগ জামাতের আদলে দল তৈরি করে মসজিদভিত্তিক গাশত করার ইতিহাসও পাওয়া যায়। বিশ্ব ইজতিমাকে হারাম ফতওয়া দিয়ে নিজেরাই বিশ্ব ইজতেমা করার ঘটনাও মুসলমানদের কাছে অজানা নয়। দারুল উলূম দেওবন্দের নেসাব এবং তাবলীগ জামাতের নেসাব নিয়ে হাজারো প্রশ্ন বাতিলদের মুখে মুখে। কিন্তু আধ্যাত্মিক নির্দেশনার বিকল্প থাকে না। অপপ্রচার হয়েছে, অপপ্রয়াস চলেছে, কিন্তু কারো অসৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি। দারুল উলূম দেওবন্দ এবং তাবলীগ জামাতের অগ্রযাত্রা অব্যাহতই ছিল–থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে এ দেশের শীর্ষ আলেমগণ তাবলীগ জামাতে কিছু ধোঁয়াশাচ্ছন্নতা আঁচ করতে পেরে ছিলেন। বিশেষ করে উপমহাদেশের শীর্ষ মুরব্বি হযরত

ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) তাবলীগ জামাতে মূল নীতি-আদর্শবিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। শুধু তাতেই ক্ষান্ত ছিলেন না বরং এসব কার্যকলাপ রোধের বিভিন্ন চেষ্টাও করেছিলেন তিনি। উলামায়ে কেরামের সামনে তিনি দুটি বিষয় তো স্পষ্টই করে ছিলেন। বাকি তিনি আর কোন কোন বিষয় নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন, তা আপাতত আমাদের জানা নেই। যে দুটি বিষয় তিনি স্পষ্ট করেছিলেন তা হলো–১। মুরব্বিদের নীতির বাইরে গিয়ে মস্তরাতের জামাত তৈরি করা এবং তাদেরকে দাওয়াতের কাজে বিভিন্ন স্থানে পাঠানো। এর বিরুদ্ধে তিনি উলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং এটি যে শরীয়তবিরোধী একটি পদক্ষেপ, তা বিবেচনার জন্য একটি কিতাবও প্রচার করেছিলেন। মূলত আল্লাহওয়ালারা যেকোনো কাজের সর্ব দিকই বিবেচনা করেন। কোনো ভালো কাজের যেমন বাহ্যিক প্রভাবের সাথে সাথে রুহানি প্রভাব বিদ্যমান থাকে, তেমনি এমন কাজও আছে, যেগুলো বাহ্যিকভাবে ভালো মনে হলেও তার অন্তর্গত খারাবির রুহানি দুস্প্রভাব পুরো সমাজেই বিস্তৃত হয়। যা প্রকাশ পায় অনেক দেরিতে। ২। তাবলীগি নেসাবে পরিবর্তন করে এ স্থলে অন্য কিতাব শামিল করা। বিভিন্ন বাতিলপন্থীদের পক্ষ থেকে তাবলীগি নেসাব তথা ফাজায়েলে আমালের ব্যাপারে অযাচিত প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। উক্ত কিতাবের রচয়িতা বিশ্ববিখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) জীবিত থাকতেও বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছিল ফাজায়েলে আমাল নিয়ে। তিনি তার জবাবও দিয়ে ছিলেন। কিন্তু হযরত ফকীহুল মিল্লাত তাবলীগ জামাতের কার্যক্রমে তখনই সন্দিহান হয়েছিলেন, যখন স্বয়ং নেজামুদ্দীনেই ফাজায়েলে আমাল নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। বরং তিনি বাতিলদের অযাচিত প্রশ্ন এবং স্বয়ং নেজামুদ্দীনে তা নিয়ে কথা বলার মধ্যে যোগসূত্রেরই যেন গন্ধ পাচ্ছিলেন। এই কারণে হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) তাঁর প্রতিষ্ঠিত মারকাযের উলূমুল হাদীস বিভাগে ফাজায়েলে আমালের প্রত্যেকটি হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজ করিয়ে ছিলেন। যার সংক্ষিপ্ত রূপ মাসিক আল-আবরারে ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে।

অতঃপর হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) জীবিতাবস্থায় বাংলাদেশের তাবলীগি জামাতে শূরা এবং এক প্রফেসরের মধ্যে সামান্য ফাটল দেখা দিলে এই বিষয় নিয়ে তাবলীগি মুরব্বি ও উলামায়ে কেরাম হযরতের কাছে আসেন। তিনি তাঁদেরকে সর্বপ্রথম তাবলীগ জামাত নিয়ে তাঁর আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন। আবার ষড়যন্ত্রকারীদের রুখে দিতে উলামায়ে কেরামকে নিয়ে পরামর্শ করেন। অতঃপর তাবলীগি জামাতে মুরুব্বি উলামায়ে কেরাম যে পক্ষে ছিলেন, সে পক্ষেই তিনি ফয়সালা দিয়ে দেন।

এর কিছুদিন পর স্বয়ং তাবলীগের মারকায নেজামুদ্দীনেই ফিতনার সূত্রপাত হয়। অতঃপর দারুল উলূম দেওবন্দের ফতওয়া জারি হয়।

মারকায নেজামুদ্দীনের সেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বাংলাদেশের তাবলীগ জামাতকেও প্রভাবিত করে। সর্বশেষ ২০১৮ সালের বিশ্ব ইজতেমা চলাকালীন উলামায়ে কেরামকে তাবলীগি মুরব্বির আগমন ঠেকানোর জন্য মাঠে নামতে হয়। ঘেরাও হয়, আন্দোলন হয়। মোটকথা, এর সবই অপ্রত্যাশিত, অপ্রীতিকর এবং কল্পনাতীত।

দারুল উলূম দেওবন্দের উপস্থিতিতে তার শাখা-প্রশাখাগুলোকে তারই নীতি-আদর্শ মেনে চলতে হবে। যতক্ষণ না দারুল উলূম দেওবন্দ শরীয়তের বাইরে কিছুর পরামর্শ দেয়। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) যে আদর্শ ও নীতিমালা গ্রহণে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত আরম্ভ করেছেন এবং পরিচালনা করেছেন, সে নীতি-আদর্শ যখনই বিবর্জিত হবে, তখনই ফিতনা আঘাত হানবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কারণ এসব আধ্যাত্মিক নির্দেশনার ওপর সৃষ্ট এবং পরিচালিত। নববী ইলম হোক বা তারবিয়াত কিংবা নববী দাওয়াতের মেহনত, উলামায়ে কেরামকে বাদ দিয়ে এসব করার চেষ্টা করা মানেই উম্মতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন জলাভূমিতে নিক্ষেপ করা। তা কখনো হতে পারে না।

উলামায়ে কেরাম তাবলীগ জামাতের নীতি-আদর্শ বেঁধে দিয়েছেন, এখানে কোনো ফান্ডিং, অর্থ লোভ, ক্ষমতালিপ্সা–কিছুই থাকতে পারবে না। বরং নিজের মাল, নিজের জান এবং নিজের সময় ব্যয় করে আল্লাহ রাস্তায় মেহনত করার নাম তাবলীগ। এর অর্থ এই নয় যে তাবলীগে সময় দিলে মুবাল্লিগ হয়ে যাবে বা এরূপ সার্টিফিকেট পাওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। বরং এর অর্থ হলো, নিজের সব কিছু ব্যয় করে নিজের ঈমান এবং আমলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা। যা কিছু প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলা থেকে চেয়ে নেওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করা। আবার ইলমের ব্যাপারে নীতিমালা হলো মাসায়েলের ইলম শেখার জন্য আলেমদের কাছে যাওয়া। তাদের শরণাপন্ন হওয়া। আলেমদের ওপর কথা না বলা। এমনকি তাদের দাওয়াতও না দেওয়া বরং তাদের কাছ থেকে দু'আ চাওয়া। এসব নীতিমালা কি মুরব্বিগণ অনর্থক দিয়েছেন?

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর স্পষ্ট বাণী আছে, এই জামাত আলেমদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফিতনায় যেন পড়ে না যায়।

সম্প্রতি সৃষ্ট সমস্যার সমাধান তাবলীগের উসুল এবং নীতি-আদর্শের মধ্যেই বিদ্যমান। যারা এই নীতি-আদর্শকে গ্রহণ করতে পারবে তারাই তাবলীগি জামাতে থাকার উপযোগী বিবেচ্য হবে। অন্যথায় নয়। তাই আমরা বলব, উম্মাহের স্বার্থে মুরব্বিদের বেঁধে দেওয়া নীতিমালায় ফিরে আসুন। সব সমস্যা সমাধান হবে এবং যাবতীয় ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা
২৪/০১/২০১৮ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ্ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٢٤) ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(١٢٥)

১২৪. শনিবার পালন তো শুধু তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করত, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত তোমার প্রতিপালক তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের বিচার-মীমাংসা করে দেবেন।

১২৫. তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা করো সদ্ভাবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎ পথে আছে, তাও তিনি সবিশেষ অবহিত। (সূরা নাহাল)

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন একটা দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেদিন তারা একত্রিত হয়ে তাঁর ইবাদত করবে খুশির পর্ব হিসেবে। এই উম্মতের জন্য ওই দিন হচ্ছে শুক্রবার। কারণ সেটা হচ্ছে ষষ্ঠ দিন, যেদিন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি কার্যপূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দেন এবং সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টি সমাপ্ত হয়। আর তিনি তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত নিয়ামত দান করেন।

বর্ণিত আছে যে হযরত মুসা (আ.)-এর ভাষায় বনী ইসরায়েলের জন্য এই দিনটিকেই নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তারা এই দিন থেকে সরে গিয়ে শনিবারকে গ্রহণ করে। তারা এই শনিবারকে এই হিসেবে গ্রহণ করে যে শুক্রবারে সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত হয়েছে। শনিবারে আল্লাহ তা'আলা কোনো জিনিস সৃষ্টি করেননি। সুতরাং তাওরাত অবতীর্ণ হলে তাদের জন্য ওই দিনকেই, অর্থাৎ শনিবারকেই নির্ধারণ করা হয়। আর তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা যেন দৃঢ়তার সাথে ওই দিনকে ধারণ করে। তবে এ কথা অবশ্যই বলে দেওয়া হয়েছিল যে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখনই আসবেন তখনই সবকে ছেড়ে দিয়ে শুধু তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। ওই কথার ওপর তাদের কাছ থেকে ওয়াদাও নেওয়া হয়। সুতরাং শনিবারের দিনটি তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছিল এবং শুক্রবারকে ছেড়ে দিয়েছিল।

হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত তারা এর ওপরই থাকে। বলা হয়েছে যে পরে হযরত ঈসা (আ.) তাদেরকে রবিবারের দিকে আহ্বান করেছিলেন। একটি উক্তি রয়েছে যে হযরত ঈসা (আ.) কয়েকটি মানসূখ হুকুম ছাড়া তাওরাতের শরীয়তকে পরিত্যাগ করেননি এবং শনিবারকে হেফাজত তিনি বরাবরই করে এসেছিলেন। যখন তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া হয় তখন তাঁর পরে কুসতুনতীন বাদশাহর যুগে শুধু ইহুদিদের হঠকারিতার কারণে ওই বাদশাহ পূর্ব দিককে তাদের কিবলা নির্ধারণ করে এবং শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে ধার্য করে নেয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষে আগমনকারী, আর কিয়ামতের দিন আমরা সবার আগে থাকব। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব আমাদের পূর্বে দেওয়া হয়েছিল এবং এই দিনটিকেও আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর ফরয করে ছিলেন। কিন্তু তাদের মতানৈক্যের কারণে তারা তা নষ্ট করে দিয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাদেরকে ওর প্রতি হেদায়াত করেছেন। সুতরাং এসব লোক আমাদের পেছনেই রয়েছে। ইহুদিরা একদিন পরে এবং খ্রিস্টানরা দুই দিন পরে। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইহুদিদের জন্য হলো শনিবারের দিন এবং খ্রিস্টানদের জন্য হলো রবিবার দিন। আর আমাদের জন্য হলো শুক্রবার দিন। সুতরাং এই দিক দিয়ে যেমন তারা আমাদের পরে রয়েছে, কিয়ামতের দিনেও তারা আমাদের পেছনেই থাকবে। দুনিয়ার হিসেবে আমরা পেছনে, আর কিয়ামতের হিসেবে আগে। অর্থাৎ সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সর্বপ্রথম ফয়সালা হবে আমাদের। (মুসলিম শরীফ)

আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তিনি যেন আল্লাহর মাখলুককে তাঁর পথের দিকে আহ্বান করেন। ইমাম ইবনু জারীরের উক্তি অনুযায়ী হিকমত দ্বারা কালামুল্লাহ ও হাদীসে রাসূল (সা.) উদ্দেশ্য। আর সদুপদেশ দ্বারা ওই উপদেশকে বোঝানো হয়েছে, যার মধ্যে ভয় ও ধমকও থাকে যে, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচার উপায় অবলম্বন করে। হ্যাঁ, তবে এটার প্রতিও খেয়াল রাখা দরকার যে, যদি কারো সাথে তর্ক ও বচসা করার প্রয়োজন হয়, তবে যেন নরম ও উত্তম ভাষায় তা করা হয়। যেমন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে, ولاتجادلوا اهل الكتٰب الا بالتى هى احسن অর্থাৎ আহলে কিতাবের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার সময় উত্তম পন্থা অবলম্বন করো। (২৯:৪৬) অনুরূপভাবে হযরত মুসা (আ.)-কেও নরম ব্যবহারের হুকুম দেওয়া হয়েছিল। দুই ভাইকে ফেরাউনের নিকট পাঠনোর সময় বলে দেন, 'তোমরা তাকে নরম কথা বলবে, তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।'

(তাফসীরে ইবনে কাসীর অবলম্বনে)

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৩৮

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে নামাযের উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে নামায–প্রথম অধ্যায় :

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

হাদীস নং-৯ :

عن ابى هريرةؓ قال : قال رسول الله ﷺ لاسهم فى الاسلام لمن لا صلوة له ولا صلوة لمن لا وضوء له۔

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, ইসলামে তার কোনো অংশ নেই। আর বিনা ওজুতে নামায হয় না।

(আল কামিল লিইবনে আদী ৩/৩৫৪ হা. ৭৯৮, ৯৮৩)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ :حَدَّثَنِي شَيْبَةُ الْخُضَرِيُّ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَحَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ، لَا يَجْعَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ، وَأَسْهُمُ ٢)) الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌالصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَالزَّكَاةُ، وَلَا يَتَوَلَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُمْ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ :لَا يَسْتُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :إِذَا سَمِعْتُمْ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ مِثْلِ عُرْوَةَ

(মুসতাদরাকে হাকেম ১/১৯ হা. ৪৯, মুসনাদে আহমদ ৬/১৪৫ হা. ২৫১২১, মুসনাদে আবু ইয়ালা ৪/৩১৪ হা. ৪৫৪৮, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১১/১৯৮ হা. ২০৩১৮, আল মুজামুল কাবীর [তাবরানী] ৯/১৭৫ হা. ৮৭৯৮, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৬/৪৮৯ হা. ৯০১২)

হাদীসটির মান : সহীহ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعِيرَازِيُّ الشِّيرَازِيُّ قَالَ :نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحَبَرِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ :نا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ :نا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طُهُورَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ

অন্য এক হাদীসে আছে, নামায ব্যতীত দ্বীন হয় না। নামায দ্বীনের জন্য এমন, যেমন মানুষের শরীরের জন্য মাথা।

(আল মুজামুল আওসাত [তাবারানী] ৩/৫৪ হা. ২৩১৩, মামাউয যাওয়ায়েদ ২/২১ হা. ১৬১৪, জামেউস সাগীর ১/১৯৩৯ হা. ৯৭০৫)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ক. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর চোখে পানি জমে গিয়েছিল। লোকেরা আরজ করলেন, এর চিকিৎসা হতে পারে; তবে সাত দিন আপনি নামায পড়তে পারবেন না। তিনি বললেন, তা হতে পারে না। আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি নামায পড়ে না সে আল্লাহর তা'আলার দরবারে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ وَقَعَ فِي عَيْنِهِ الْمَاءُ، فَقِيلَ لَهُ نَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْ عَيْنِكَ عَلَى أَنَّكَ لَا تُصَلِّي سَبْعَةَ أَيَّامٍ، فَقَالَ :لَا، إِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَهُوَ يَقْدِرُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

(আল মুজামুল কাবীর [তাবারানী] ১১/২৯৪ হা. ১১৭৮২, আস সুনানুল কুবরা [বায়হাকী] ২/৩০৯ হা. ৩৬৮৪)

হাদীসটির মান : সহীহ

খ. হযরত উমর (রা.) শেষ সময়ে যখন খঞ্জর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হন, তখন সব সময়ই তাঁর ক্ষত স্থান হতে রক্ত জারি থাকত এবং অধিকাংশ সময়ই তিনি একেবারে বেখবর অবস্থায় থাকতেন, এমনকি এই অবস্থায় তাঁর ওফাতও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই দিনগুলোতে যখন নামাযের সময় হতো তখন তাঁকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে নামায পড়ার জন্য দরখাস্ত করা হতো। তিনি এই অবস্থাতেই নামায পড়তেন এবং বলতেন হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا، فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ : عُمَرُ :نَعَمْ .وَلاَ حَظَّ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ، فَصَلَّى عُمَرُ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا

[মুওয়াত্তা মালেক (রহ.) ১/৩৯ হা. ১৫, আল মুজামুল আওসাত ৮/১৬৯, হা. ৮১৮১, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/২৯৫ হা. ১৬৩৬]

হাদীসটির মান : সহীহ

গ. হযরত আলী (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেদমতে হাজির হয়ে কাজকর্মের সাহায্যের জন্য একজন খাদেম চাইলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ কলেন, এই তিনজন গোলামের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয় নিয়ে যাও। হযরত আলী (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই পছন্দ করে দিন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজনকে দিয়ে বললেন, একে নিয়ে যাও। কিন্তু একে মারধর করো না। কেননা নামাযীকে মারধর করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا لَيْثُ بْنُ هَارُونَ الْعُكْلِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، قَالَا :ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ عَلِيًّا: قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ادْفَعْ إِلَيَّ خَادِمًا، فَقَالَ لَهُ :فِي الْبَيْتِ ثَلَاثَةٌ اخْتَرْ مِنْهُمْ وَاحِدًا .فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ، اخْتَرْ لِي أَنْتَ، فَقَالَ :خُذْ هَذَا الْغُلَامَ، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ صَلَّى مُنْذُ خَرَجْنَا مُنْذُ حِينٍ وَلَا تَضْرِبْهُ، فَإِنَّا نُهِينَا عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ

(আল মুজামুল কাবীর [তাবারানী] ৮/৩৪৪ হা. ৮১০০, মুসনাদে আবু ইয়ালা ৩/৩৬৩ হা. ৩৩৭০)

হাদীসটির মান : হাসান

[প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত] *(চলবে ইনশাআল্লাহ)*

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

গোনাহ থেকে বাঁচার উপকারিতা :
প্রভাতে মানুষ যখন প্রক্ষালন করে বা মুখ ধুয়ে থাকে হঠাৎ শারীরিক ও মানসিক যে খুশি ও আনন্দ অনুভব করে থাকে, তা সারা দিন টেকসই হয়। তেমনি মানুষ যখন গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকে এবং হুকুম আদায় করতে থাকে তখন মন খুব ভালো থাকে। চিত্তে অনুভব করতে থাকে। বলাই বাহুল্য, অন্তরের খুশি ও স্থিরতা বড় কথা। প্রত্যেক লোক তা-ই খুঁজে বেড়ায়। সামান্য চিন্তা করলেই এই অবস্থাটা অর্জিত হতে পারে। গোনাহ থেকে যত বেশি নিরাপদ থাকা যায়, ততই স্থিতি ও খুশি অর্জিত হতে থাকবে। গোনাহ যত বেশি হবে, অন্তরের অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি পাবে। শঙ্কা, সংশয় ও পেরেশানি জেঁকে বসবে। এ কারণে একটি সাবধানতাই যথেষ্ট তা হলো গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

ইলম অর্জন করা জরুরি :
মানুষ নিজের বা নিজের সম্পর্কীয়দের ব্যাপারে খেয়াল রাখে। দৈহিকভাবে অসুস্থ হয়ে গেলে নিজের চিকিৎসা করাতে থাকে। স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি বা আত্মীয়-স্বজন অসুস্থ হলে তাদের উপযোগী চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। এমনিভাবে দ্বীনি বিষয়ে ফিকির করা উচিত। দ্বীনের ব্যাপারে যেসব কমতি এবং দুর্বলতা আছে সেগুলোর সংশোধনের ফিকির করা উচিত। এটি প্রত্যেকের দায়িত্ব। এ কারণে প্রত্যেকের ইলম অর্জন এবং এর ওপর আমল করা জরুরি। সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া, তাদের চরিত্র গঠন জরুরি। এতে অবহেলা না করা উচিত। এ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবেই আমাদের অবহেলা পরিলক্ষিত হয়।

বিশেষ নসীহত :
মজলিসে বসে গল্পগুজব করো না, মৌনভাবে বসে থাকো। মনোনিবেশ করে কথাগুলো শোনো। একে মূল্যায়ন করো। পড়ালেখার কদর করো। ইলমের মূল্যায়ন করো। পরে সুযোগ নাও হতে পারে, তাই সময় নষ্ট করা যাবে না। আগের সবক এবং বর্তমান সবক ভালোভাবে শিখে নাও। তাতে তারাবীতেও সহজ হবে। মানসিকতাও ভালো থাকে। শুরুতেই কাজ হয়ে যায় এবং এরূপ ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকগণ খুশি থাকেন।

আত্মশুদ্ধির উপকারিতা :
মানুষের অন্তর ঠিক, তবে সবই ঠিক। যেমন বিদ্যু চলে গেলে এয়ার কুলার বন্ধ হয়ে যায়, পাখা, লাউড স্পিকার সবই বন্ধ হয়ে যায়। যখন জেনারেটর চালু হয় সবই ঠিকমতো চালু হয়ে যায়। এরূপ আল্লাহ তা'আলা সবইকে একটা জেনারেটর দান করেছেন। তা হলো অন্তর। তার চালু করার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা, ভক্তি এবং ভয় প্রয়োজন মতে অন্তরে সৃষ্টি হওয়া। এটি আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শ ও বরকতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এর অন্যান্য পদ্ধতিও আছে তবে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো এটি। যখন অন্তর চালু হয়ে যাবে তখন সব কাজই ঠিক হয়ে যাবে। তবে অন্তর সামান্য দেরিতেই শুদ্ধ হয়। এর জন্য ফিকির প্রয়োজন। সামান্য মেহনত ও চেষ্টা মোজাহাদা করে নিন, গুরুত্ব সহকারে করুন, নসীহত এবং নির্দিষ্ট-নিয়মমতো কাজ করুন তবে অচিরেই অন্তর ঠিক হয়ে যাবে। যেমন হাসপাতালে ভাঙা হাড়ে প্লাস্টার লাগানো হয়, চলাফেরায় সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এবং কিছু দিনের মধ্যে সে ভাঙা হাড় ভালো হয়ে যায়। অতঃপর মানুষ স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারে, তেমনি এই বিষয়েও ফিকির করুন। ক্রমান্বয়ে ভালো হয়ে যাবে।

যোগ্যতা অনুসারেই ফয়জ অর্জিত হয় :
এক আল্লাহওয়ালার কাছে এক লোক বাইআত গ্রহণ করেন। পনেরো দিনের মাথায় তিনি যখন ঘরে ফিরে যাবেন তখন ওই আল্লাহওয়ালা শায়খ তাঁকে খিলাফতনামা দিয়ে দেন। তথায় যারা পুরাতন এবং বহুদিন ধরে বসে আছে তাদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হলো। এই লোক পনেরো দিনের মধ্যেই খিলাফত নিয়ে গেল। শায়খ তাদের অন্তরের সন্দেহ-সংশয়ের কথা জানতে পারলে দু-এক দিন পর তিনি বললেন, আমার গোসল করার প্রয়োজন, তাড়াতাড়ি গোসল করতে হবে। তাই বিলম্ব না করে নিমের কাঁচা লাকড়ি দিয়ে পানি গরম করো। আধাঘণ্টা পর জিজ্ঞেস করলেন, পানি কি গরম হয়েছে? বলা হলো–না। আবার কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলল, না হুজুর। জ্বালানি কাঁচা হওয়ায় তা জ্বলছে না। তখন বললেন–না, আম গাছ জ্বালিয়ে পানি গরম করো। তা শুকনো ছিল। তখন এক-দুই মিনিটের মধ্যে পানি গরম হয়ে গেল। এই কথা জানার পর তিনি বললেন, এত তাড়াতাড়িই গরম হয়ে গেল? তারা বলল, আগের লাকড়িগুলো কাঁচা ছিল। তাই জ্বালানো সম্ভব হয়নি। পরের লাকড়িগুলো ছিল শুকনো। তাই তাড়াতাড়ি জ্বালানো সম্ভব হয়েছে। তখন শায়খ বললেন, পনেরো দিনের মধ্যে যিনি ফিলাফতপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি ছিলেন শুকনো লাকড়ির ন্যায়। তাই তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে গেছে। আর তোমরা হলে কাঁচা লাকড়ির ন্যায়। তাই দীর্ঘদিন থেকে মেহনত করেও কাজ হচ্ছে না। যেমন, কার্পেট রোদে শুকাতে অনেক সময় প্রয়োজন হয় আর কাপড় শুকাতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক মিনিট।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

খানেকাহের মাসিক ইজতিমায়

উলামায়ে কেরামের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد!

فقدقال النبى صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم (ابن ماجه ٢٠ رقم الحديث ٢٢٤)

وقال النبى صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب (بخارى ١/٢٣٤ رقم الحديث١٧٤١)

মুহতারাম উলামায়ে কেরাম, আযীয তলাবা!

আজকে মাসিক ইজতেমা। এ রকম প্রতি মাসে হয়। বিভিন্ন কারণে আজকের এ ইজতেমার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ গুরুত্ব সামনে রেখে আমি দুটি হাদীস শোনালাম। তৃতীয় হাদীসটি অনেক দীর্ঘ। এটা বোখারী শরীফের হাদীস। আসল কিতাব থেকেই শোনাচ্ছি :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ -رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم : إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا :هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ : فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ :فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عز وجل -وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ -مَا يَقُولُ عِبَادِى؟ قَالُوا :يَقُولُونَ :يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ قَالَ :فَيَقُولُ :هَلْ رَأَوْنِى؟ قَالَ :فَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ :فَيَقُولُ :وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِى؟ قَالَ :يَقُولُونَ :لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ تَمْجِيدًا، وَتَحْمِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا، قَالَ : يَقُولُ :فَمَا يَسْأَلُونِى؟ قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ، قَالَ :يَقُولُ :وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ : يَقُولُونَ :لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ : يَقُولُ :فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ : يَقُولُونَ :لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ :فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ : يَقُولُونَ :مِنَ النَّارِ، قَالَ :يَقُولُ :وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ :يَقُولُونَ :لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ :يَقُولُ :فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، قَالَ :يَقُولُونَ :لَوْ رَأَوْهَا، كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ :فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ : يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ :فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ :هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ .

(صحيح بخارى)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার কিছু ফেরেশতা এমন আছেন, যাঁরা জিকিরকারীদের অন্বেষণে রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করেন। অতঃপর তাঁরা যখন এমন লোকের সন্ধান পান, যারা আল্লাহ তা'আলার জিকিরে লিপ্ত, তখন তাঁরা অন্য ফেরেশতাদের ডাক দিয়ে বলেন, এসো এসো! উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে, আল্লাহ তা'আলার জিকিরকারীদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এরপর ফেরেশতাগণ জিকিরকারীদেরকে নিজের ডানাসমূহ দ্বারা দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত ঘিরে নেন। অতঃপর তাঁদের পালনকর্তা তাঁদের জিজ্ঞেস করেন (জিকিরকারীদের সম্পর্কে), অথচ তিনি ফেরেশতাদের চেয়ে বেশি জ্ঞাত যে, তাঁর বান্দারা কী বলছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, তারা আপনার তাসবীহ পড়ছে। (সুবহানাল্লাহ বলছে), আপনার তাকবীর পড়ছে (আল্লাহু আকবর বলছে), আপনার প্রশংসা করছে এবং আপনার বড়ত্ব বর্ণনা করছে। আবার আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশতাগণ জবাবে বলেন, না–আল্লাহ তা'আলার কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা যদি আমাকে দেখত, তাদের কী অবস্থা হতো? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, যদি তারা আপনার দিদারে ধন্য হতো তবে আপনার ইবাদত এর চেয়ে বেশি করত, আপনার বড়ত্ব আরো বেশি বর্ণনা করত, আপনার তাসবীহ আরো বেশি পড়ত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কী চায়? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, তারা আপনার কাছে বেহেশত চায়। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, তারা কি বেহেশত দেখেছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, না–আল্লাহর কসম! হে পরওয়ারদেগার তারা তা দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের কী অবস্থা হতো যদি তারা বেহেশত দেখে নিত? ফেরেশতাগণ আরজ করলেন, যদি তারা তা দেখত, তবে অনেক বেশি বেহেশতের লোভী হতো, অনেক বেশি বেহেশতের তলবকারী হতো এবং অনেক বেশি তার আকাঙ্ক্ষাকারী হতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কোন জিনিস থেকে পানাহ চায়। ফেরেশতাগণ আরজ করেন, দোযখ থেকে। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, তারা কি দোযখ দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেন,

আল্লাহ তা'আলার শপথ! তারা দোযখ দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কী অবস্থা হতো, যদি তারা তা দেখত? ফেরেশতাগণ আরজ করলেন, যদি তারা তা দেখত তবে অনেক বেশি দোযখ থেকে পলায়ন করত এবং সীমাহীন ভয় করত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। ফেরেশতাদের মধ্যে একজন আরজ করলেন, হে পালনকর্তা! তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে, যে জিকিরকারীদের মধ্যে ছিল না। বরং সে কোনো প্রয়োজনে এসে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, জিকিরকারী এবং ইবাদতকারীরা তো এমন সহচর যে, তাদের মজলিশের উপস্থিতিও তাদের কারণে বঞ্চিত হয় না। (বোখারী শরীফ, কিতাবুদদাওয়াত, জিকিরের ফজীলতের অধ্যায়, হাদীস নং-৬৪০৮)

দাওয়াতের বিষয়বস্তু

তিনটি হাদীস শোনানো হলো। হাদীসগুলো এমন একটা জামাতের সামনে শোনানো হচ্ছে, যার প্রত্যেক সদস্য মুসলমান ও ঈমানদার। অমুসলমানদের মজমাতে এ হাদীসগুলো শোনানো হবে না। তাদেরকে শোনানো হবে শুধু একটা হাদীস। তুমি ঈমান নিয়ে আসো

قولوا لااله الاالله تفلحوا(مسند احمد ٤٦٢/٣)

'বলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, সফলকাম হবে।' মুসলমানের মজমাতে এটার দরকার নেই। অমুসলমানদের জন্য এই দাওয়াতই যথেষ্ট। কারণ অমুসলিমরা مكلف بالفروعات (ঈমান ব্যতীত অন্যান্য আমলের ভারার্পিত) নয়। তারা কেবল ঈমানের مكلف (ভারার্পিত)। মুসলমান সে তো ঈমান এনেছে, এখন সে মৌলিক তিনটি জিনিসের مكلف তথা তিনটি জিনিসের দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়। বাকিগুলো এই তিনটির শাখা-প্রশাখা। তিনটির মধ্যে তরতীব আছে। তিনটি আপনার ইচ্ছে মতে হলে হবে না।

১. ইলম

এক নম্বরে হলো علم । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদের জন্য ইরশাদ করেন–

طلب العلم فريضة على كل مسلم

মুসলমান হয়েছো, ইলম শিখতেই হবে। এক নজরে মৌলিক আকীদাগুলো জানতে হবে। আমাদের এখানে, তথা বসুন্ধরা মারকাযে প্রতিদিন সকালে যে আকীদাগুলো শোনানো হয় সকলে শোনে। কিন্তু গুরুত্ব কতটুকু দেওয়া হয়, সেটা তো যারা শোনে, তারাই বোঝে। এটা এক নম্বরের ফরয। এর মধ্যে কিছু কমানো যাবে না।

ঈমানে মুজমাল আর ঈমানে মুফাসসাল মক্তবে আমরা পড়েছি, আপনারাও পড়েছেন। এটাকে বুঝেশুনে পড়েন, এটা এক নম্বরের ফরয। এটি প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই। নারী হোক আর পুরুষ হোক।

দ্বিতীয় নম্বর হলো, কোরআন শরীফের কিছু অংশ শুদ্ধ করে শেখা। কোরআন শরীফ বলিনি। কোরআনের কিছু অংশ বলেছি। পাঁচটা সূরা, ছোট ছোট সূরা শুদ্ধ করে মুখস্থ করা। এটা দ্বিতীয় নম্বরের ফরয। ক্রমান্বয়ে বলা হবে, ইলম শেখা ফরয। আকীদা শিখে নেওয়া ফরয। কোরআন শরীফ এটুকু শেখা ফরয। এরপর নামায কিভাবে পড়বেন? তা শিখে নেওয়া ফরয।

নামাযে হাত উঠানো, যা رفع يدين নামে প্রসিদ্ধ, আমীন বড় করে বলা না বলা। এগুলো নামাযে না শিখলেও কী হবে আর শিখলেই বা কী? নামাযে তো শিখতে হয় যেগুলো না হলে নামায হয় না। যেগুলো না হলে নামায পুনরায় আদায় করতে হয়। এতটুকু জানা ফরযে আইন, যা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীকে জানতেই হবে।

কোরআন শরীফ নামাযে পড়া না হলে নামাযই হবে না। এ জন্য কোরআন শরীফকে আগে রেখেছি। নামাযে কোরআন শরীফ পড়েন, কিন্তু শুদ্ধ পড়েন না, তাহলে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন আপনি নিজেকে নামাযী কিভাবে দাবি করবেন? আপনি তো ফরয ছেড়ে দিয়েছেন। কোরআন শুদ্ধ করে পড়া ফরয।

আপনি নামাযে হাত না উঠান, নামায পুনরায় আদায় করতে হবে না। হাত উঠানো কোনো বড় ফজীলতের কাজ না। আমীন বড় করে না বলেন তাতে নামাযের কোনো ক্ষতি নেই। আর আমীন কেউ বড় করে বলেছে, তাতে বড় কিছু করে ফেলেছে, তাও না। তদুপরি এগুলো সাহাবা যামানা থেকে মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়, তাবেঈনের যামানা, মুহাদ্দিসীনের যামানা, ফুকাহাদের যামানা তথা সব সময় এগুলো মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়। এর কারণ হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমলে কোনো সময় এটা করা হয়েছে, কোনো সময় ওটা করা হয়েছে। এ রকম বিষয়কে আমলের মধ্যে গুরুত্ব দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ?

নামাযের ওই সমস্ত মাসআলা জানা ফরয, যেগুলো না হলে নামায হয় না, নামায পুনরায় আদায় করতে হয়। এ নিয়মানুসারে এ ধরনের ইলম এক নম্বরে শিখতে হবে।

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

দারুল উলূম দেওবন্দ এই ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) এই ফরযগুলো শেখানোর জন্য দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানি, আল্লাহ পাক ব্যাপক কবুলিয়্যত দান করেছেন। এই দারুল উলূমের এখন প্রায় ২০০ বছর। মুরব্বিদের যামানা প্রায় ১০০ বছর বা একটু বেশি হবে। এরপর আরো ১০০ বছরের কাছাকাছি, যা متأخرين এর যামানা। এখন মুরব্বি আর নেই।

متقدمين পূর্বসূরিরা চলে গেছেন। এখন মুরব্বির জায়গায় বসেছেন متأخرين। এ জন্য আমরা তাঁদেরকে মুরব্বিদের মতো শ্রদ্ধা করি। তা প্রত্যেকেরই করতে হবে। দারুল উলূম দেওবন্দ ২০০ বছরের ইতিহাসে–

طلب العلم فريضة على كل مسلم

কে বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করেছে। এমন কাজ করেছে, সারা দুনিয়াতে সঠিক পদ্ধতিতে ইলমের প্রচার-প্রসার হয়েছে দারুল উলূম দেওবন্দের মাধ্যমে। বিশেষ করে এ উপমহাদেশ, হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে। বর্তমানে সর্বত্র মাদরাসাগুলোর মাধ্যমে ইলমের যে চর্চা হচ্ছে, তার সবই দারুল উলূম দেওবন্দের বরকত।

'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইলম অর্জন করা ফরয' প্রত্যেক মুসলমান বলতে পুরুষ ও নারী উভয়কে বোঝায়। উক্ত হাদীসের নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য যে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা কিন্তু আপনার নিজস্ব চাহিদা মতে কাজ করেনি। আপনার তো মনে চায় পুরুষেরও মাদরাসা হোক, নারীরও মাদরাসা হোক। কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দ নারীদের কোনো মাদরাসা করেনি। তার দীর্ঘ ইতিহাসে এরূপ কোনো কর্মসূচি পাওয়া যায় না।

এখন কথা হলো, নারীদের জন্যও তো ইলম অর্জন ফরয। এরা কোত্থেকে শিখবে? আচ্ছা বলুন তো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যামানায় কিভাবে শিখেছিল, চার খলিফার যুগে নারীরা কিভাবে শিখেছিল? ইমাম আবু হানীফার যুগে নারীরা কিভাবে ইলম অর্জন করেছিল, ইমাম মালেক (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর যামানায় নারীরা কিভাবে শিখেছিল? যুগে যুগে নারীরা কিভাবে ইলম শিখেছিল এর ইতিহাস সবার জানা। না জানলে তা মূর্খতা। যাই হোক, কথায় কথা আসে, সে জন্য বললাম।

দোষ বৃষ্টির নয়, মাটির

ঠিক যে সময়ে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করা হয় সে সময় আরেক মেরুতে ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ। হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) যেখানে পড়াশোনা করেছিলেন তিনিও সেখানকার ছাত্র। লেখাপড়া ঠিকই ছিল। আসমান থেকে বৃষ্টি একই সাথে নামে। লোনা জমিতে হলে ফসল হয় না। আর ভালো মাটিতে পড়লে সব ধরনের ফসল হয়। একই জায়গাতে দুজনই লেখাপড়া করেন। কিন্তু দুজন দুই দিকে গেলেন কেন? স্যার সৈয়দ আহমদ সাহেবের একটি উক্তি ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। "কাসেম বড় অভিজ্ঞ, তীক্ষ্ণ ও মেধাবী তালেবে ইলম ছিল। কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাই এরূপ একজন অভিজ্ঞ আলেম হয়ে সে মাদরাসার যেই পাঠ্যসূচি তৈরি করেছে, এই পাঠ্যসূচি দিয়ে মানুষের পেটের কোনো ব্যবস্থা করেনি। যে পাঠ্যসূচিতে আছে শুধু আসমানের ওপরের কথা আর জমিনের নিচের কথা। আসমানের নিচে ও জমিনের ওপরের কোনো কথা সেখানে রাখেনি। বিজ্ঞান রাখেনি, ইতিহাস, ভূগোল রাখেনি, সায়েন্স রাখা হয়নি।"

এটা ছিল স্যার সৈয়দের উক্তি। কিন্তু কাসেম নানুতবী (রহ.) যে পন্থা অবলম্বন করেছেন সে সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তি হলো, তোমরা আল্লাহর জিকির করতে থাকো, আল্লাহকে রাজি করার জন্য কাজ করো, করতে থাকো, এত বেশি করো, যেন মানুষ তোমাকে পাগল বলে। হাদীসের শব্দ হলো–

اكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون (مسند احمد ٣/٦٨، رقم الحديث ١١٦٥٣)

"এত বেশি যিকির করো, যেন তোমাকে লোকেরা পাগল বলে।"

স্যার সৈয়দ আহমদ সাহেবের উক্তিতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, কাসেম নানুতবী এত প্রখর মেধাসম্পন্ন ছাত্র হয়ে পাগলের মতো এসব কী করছে? তাই বলা উদ্দেশ্য। বোঝা গেল, হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) হাদীসের আবেদনই পূর্ণ করলেন আর স্যার সৈয়দের উক্তিটা হাদীসের ব্যাখ্যা হয়ে রয়ে গেল।

বদনাম করার অপচেষ্টা

হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য কাজ করেছিলেন। তার প্রমাণ তাঁর কাজের বরকত এত দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমরা পাচ্ছি। বাংলাদেশের মতো দেশে কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর অনুসারী উলামা-তলাবা এবং এদের সাহায্যকারীদের কী বলা হচ্ছে। কোনো সময় বলা হচ্ছে মৌলবাদী, কোনো সময় জঙ্গি। একেক সময় একেক নামে আমাদেরকে সম্বোধন করা হাচ্ছে।

ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন করেছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মুরব্বিগণ। সব কিছু বুঝে আসবে। এ কারণে দেওবন্দের মুরব্বিদেরকে বদনাম করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কিছু হালুয়া-রুটিতে বিক্রীত মৌলভীদের ব্যবহার করে। তাদের বলতে শেখায় এরা ওহাবী। ওহাবী শব্দটি ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু হয়েছে। এখনো কোথাও কোথাও আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

একসময় ওহাবী বলত, আরেক সময় মৌলবাদী, আরেক সময় জঙ্গি! বাস্তবে তাদের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক?

কিন্তু الحمد لله আমরা আমাদের জায়গাতেই আছি। আমরা জঙ্গিও না, মৌলবাদীও না, আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ জীবনের অনুসারী। সুন্নাতে রাসূলের অনুসারী। এটাকে যদি কেউ মৌলবাদ বলে তাহলে আমরা মৌলবাদী। আমরা জঙ্গি কোনো দিন ছিলাম না, হবও না। আমরা মুজাহিদ ছিলাম মুজাহিদ হব। কোরআন জিহাদের দাওয়াত দিয়েছে তাই আমরা মুজাহিদ হব। জঙ্গি হতে পারব না। মুসলমান সন্ত্রাসী হতে পারবে না। মুসলমান হাইজ্যাকার হতে পারবে না। আদর্শ মুসলমান মুজাহিদ হবে। মানবতার সেবক হবে। এখন কেউ যদি জঙ্গি বলে এতে আমাদের কী আসে যায়?

২. জিকির

দারুল উলূম দেওবন্দ ইলমের ওপর মেহনত করেছে। ইলমের চর্চা যখন একটা স্তরে পৌঁছে যায়, তখন তারা আরেকটি কাজে আত্মনিয়োগ করে। এই দ্বিতীয় কাজটি হলো : ذكر الله "আল্লাহর জিকির"। এর চর্চা কী রূপে হয়েছিল দেখুন। কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর মতো কালজয়ী আলেম দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর কাছে দোজানু হয়ে মুরীদ হন। বাইআত হন। এত বড় আলেম হওয়ার পরও তিনি বাইআত হন। বর্তমান যুগেও বাইআত হয়। বাইআত হওয়ার পর পীর আর মুরীদের কোনো খবর থাকে না। তাঁরা এরূপ বাইআত হননি। বরং পীর যা বলতেন তা-ই তাঁরা করতেন।

একবার তিনি যিকির করছিলেন। যিকির করতে করতে যিকিরের আওয়াজের আকর্ষণে বড় এক বিষাক্ত সাপ তাঁর পাশে এসে তাঁর সাথেই যিকির করেছে। তাদের যিকিরের আওয়াজ তো এখন আর নেই। তখনকার যাকেরীনরা শক্তিশালী ছিলেন। যাকেরীনদের যিকির আমিও দেখেছি। এই ধরনের যিকির এতই কঠিন ছিল যে, সেই যিকির আমি ২-৩ বারের বেশি করতে পারব না। لا الله বলতে বলতে মাথাকে পেছন থেকে ঘুরিয়ে لا الله বলে কলবের দিকে এনে কলবের ওপর এমনভাবে চাপ দেয় যে, মাথা আর কলব এক জায়গায় হয়ে যায়। কাসেম নানুতবী (রহ.) যিকির করার সময় لا الله বলে যখন মাথা পেছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ডান দিকে নিয়ে এলেন আর لا الله বলার সময় কলবের ওপর চাপ দিলেন, তখন ওই সাপ তাঁর মাথাকে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘুরিয়ে মাটির ওপর দপ করে মারে। কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর হুজরা ছিল মসজিদের পাশে। বাইরে যারা মসজিদের উদ্দেশ্যে এসেছে, তারা দপ দপ এক বিকট আওয়াজ শুনতে পায়। তখন হুজরার দরজা ছিল বন্ধ। এরা কৌশলে দরজা খুলে দেখে এই সাপ জোরে জোরে মাথা মারছে। কাসেম নানুতবী (রহ.) যখন মাথা কলবের ওপর মারেন সাপ তখন মাটিতে মাথা মারে।

কে এই কাসেম নানুতবী (রহ.)? যিনি দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ছিলেন ইলমের সাগর। দুশমনও সাক্ষ্য দিচ্ছে। উনার ইলমের সামনে পুরো দেওবন্দী হালকার বড়-ছোট উলামায়ে কেরাম সবার ইলম একত্রিত করলে তার ইলমের পাল্লা ভারী হবে। চিন্তা করুন। এ রকম একজন ব্যক্তির কথা বললাম, কী হাল? এই যে জিকির করলেন, যিকির চুপে চুপে করেননি। উঁচু আওয়াজে করেছেন বলেই তো সাপ এসেছে।

দাউদ (আ.) যখন আল্লাহ পাকের যিকির করতেন, বিভিন্ন ধরনের পাখিরা এসে তাঁর সাথে যিকির করত। এ কথা কোরআন মজীদে আছে।

ইলমের সঙ্গে যিকিরের লাইন খুলে দিয়েছেন। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.), আশরাফ আলী থানভী (রহ.), মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) প্রমুখ হলেন দেওবন্দী সিলসিলার বড় বড় আলেম। তাঁরা যিকির করেছেন। সাহারানপুরে হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব (রহ.)-এর যিকিরের হালকা হতো। তারপর হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর যিকিরের হালকা কত বড় ছিল! আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি। প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর তাঁর সেখানে যিকির হতো। যাকেরীনের সংখ্যা কখনো ৫০-৬০, কখনো ৮০-৯০-১০০ জন পর্যন্ত হয়ে যেত। সবাই বড় আওয়াজে যিকির করেছেন। হযরত কাউকে বলেননি তোমরা চুপে চুপে যিকির করো। যিকির থেকে ফারেগ হয়ে যার যার কাজে চলে যেতেন।

আমি আর মাওলানা ত্বালহা সাহেব মুদ্দাজিল্লুহু (হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর সাহেবজাদা, যিনি বর্তমানে জীবিত আছেন।) হিন্দুস্তানে مستجاب الدعوات হিসেবে প্রসিদ্ধ। আমরা দুজন اسم ذات এর জিকির করতাম। হযরতের পাশেই এই যিকির করতাম। তাঁর আর আমাদের মাঝে ছয়-সাত হাতের মতো দূরত্ব। হযরত কিছু দ্বীনি কাজ করছেন, কী যেন লেখাচ্ছেন। তাই আওয়াজ একটু ছোট করে যিকির করতে ছিলাম। হযরত আমাদের কাছে খাদেমকে পাঠালেন এই বলে যে, তাদেরকে বলো, তাদের যিকিরে যেহরিতে আমার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। এই ছিল সাহারানপুরের যিকির।

৩. তাবলীগ

নেজামুদ্দীনের হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) গঙ্গুতে জিকির করতে করতে তো পুরা শরীর একেবারে শুকিয়ে ফেলেছিলেন। হাড্ডি ছাড়া গোশত ছিল না। সারা রাত যিকিরে যেহেরি করতেন। তিনি একদা হজে গেলেন। ইচ্ছা হলো মদীনা শরীফ থেকে আর আসবেন না। কিন্তু রওজায়ে পাকের জিয়ারতে গেলে, গায়েবীভাবে ইঙ্গিত করা হলো, তুমি হিন্দুস্তান চলে যাও। تم سے کام لیا جائیگا "তোমার কাছ থেকে কাজ নেওয়া হবে।" হযরত ইলিয়াস পেরেশান। আমি দুর্বল মানুষ, কোনো কাজের উপযুক্ত নই। আমি কী কাজ করব। এই পেরেশানিতে তাঁকে দেখলেন, হযরত মাদানী (রহ.)-এর এক ভাই। যিনি মদীনা শরীফে মুহাজির ছিলেন। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর মুজায এবং আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-কে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এত পেরেশান কেন? উত্তরে তিনি বললেন, হযরত! পেরেশান হওয়ার কারণ হলো, রওজায়ে পাক থেকে আমার প্রতি ইশারা করা হলো–

تم ہندوستان چلے جاو تم سے کام لیا جائیگا

"তুমি হিন্দুস্তান চলে যাও, তোমার কাছ থেকে কাজ নেওয়া হবে।" আমি দুর্বল মানুষ, কী কাজ করব? তিনি বললেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইশারায় আপনাকে বলা

হয়েছে–

تم ہندوستان چلے جاؤ تم سے کام لیا جائیگا

আপনাকে তো বলা হয়নি کام کرو (কাজ করো) যখন বলা হয়েছে کام لیا جائیگا (কাজ নেওয়া হবে)। সুতরাং কাজ যিনি নেবেন, তিনিই জানেন কিভাবে আপনার কাছ থেকে কাজ নেবেন। এর জন্য চিন্তা কিসের?

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) হিন্দুস্তানে চলে আসার পর আল্লাহ তা'আলা তাবলীগের কাজ নিলেন। সারা দুনিয়ায় তাবলীগ চলছে। সেই নেজামুদ্দীন মসজিদের ভেতরে-বাইরে শেষ রাত্রে যিকিরের আওয়াজে সারা নেজামুদ্দীনের বস্তি কাঁপত। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁরই সাহেবজাদা হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহ.) একই যিকির এবং বাইআত মুরীদের কাজ করেছিলেন। তাঁর পর হযরত মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব (রহ.)। তাঁদের উভয়ের সাথে আমি তাবলীগ করেছি। নেজামুদ্দীনে একই সাথে বাইআত-মুরীদিও হচ্ছে আবার যিকিরও হচেছ। মসজিদের ভেতরে-বাইরে যিকিরের হালকা।

আমি বলেছিলাম, প্রথম কাজ হলো ইলম, দ্বিতীয় কাজ হলো যিকির। যিকিরের মাধ্যমে ইলমকে নুরানী করার পর দাওয়াত ও তাবলীগ। এই তিন কাজ একজন মুসলমানের, একজন হক্কানী আলেমের ও দেওবন্দী হালকার। দেওবন্দী হালকায় যাদের থাকতে মনে চায়, তাদের এই তিনটি কাজ করতে হবে।

হক্কানী জমাআতের পরিচয় :

হক্কানী জামাআত একমাত্র দেওবন্দী হালকা। এ হক্কানী জামাআতে থাকতে হলে প্রথমে কোরআন শুদ্ধ করতে হবে। আকীদা শুদ্ধ করতে হবে। নামায সুন্নাত মোতাবেক, সহীহ-শুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যিকিরের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। যিকিরের হালকা কায়েম করতে হবে। আলেমরাও যিকির করবে। যারা আলেম নয়, তারাও যিকির করবে, যিকিরের হালকা কায়েম করবে। আকীদা দুরস্ত করে যিকির করবে। কোরআন শুদ্ধ করে যিকির করবে। আপনার আকীদা দুরস্ত নেই আপনার যিকিরের কী দাম? আপনি সুন্নাত আর বিদ'আত পার্থক্য করতে পারেন না। বিদ'আতকে সুন্নাত মনে করেন, সুন্নাতকে বিদ'আত মনে করেন। আপনার কী যিকির? এগুলো ঠিক করার পর যিকির। যিকির যখন ঠিকমতো হবে যিকিরের মাধ্যমে কোরআনের বরকত, হাদীসের বরকত ও নামাযের বরকত সব পাওয়া যাবে।

যিকির করার পদ্ধতি :

এখন কথা হলো, যিকির কিভাবে করবেন? যিকিরের কথা কোরআনেও আছে, হাদীসেও আছে। কোথাও বড় আওয়াজে যিকিরের কথা আছে, কোথাও আছে ছোট আওয়াজে যিকির করার কথা। যিকিরের ব্যাপারে এমন কোনো কথা নেই যে, শুধু চুপে চুপে করতে বলা হয়েছে। এমনটিও নেই, যেখানে যিকির শুধু জোরে জোরে করতে বলা হয়েছে।

তবে যিকিরে জেহের করলে আল্লাহর কাছে ভালো লাগে। হাদীস আপনাদের সামনে আছে। একটা তো তিন নম্বর হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, যিকিরের হালকা ফেরেশতারা তালাশ করে। আরেকটা হাদীস হলো–

فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم (بخارى ٢/١١٠١، رقم الحديث ٧٤٠٥)

"যারা একা যিকির করে আমি একা তাদের স্মরণ করি। যারা জামাআতের সাথে যিকির করে আমি তাদের জামাআতের চেয়ে ভালো জামাআতে তাদের আলোচনা করি।

وان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم

হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, জোরে যিকির আল্লাহর কাছেও পছন্দ, রাসূলের কাছেও পছন্দ।

কিন্তু উচ্চস্বরে যিকিরের মধ্যে রিয়ার সম্ভাবনা থাকে। রিয়া বলা হয় লোক দেখানো কাজকে। তবে রিয়া হবে কোনো কাজ লোক দেখানোর নিয়্যাতে করলে। আপনি জিকিরে যেহেরি করছেন, অন্যদিকে কেউ দেখছে এটা রিয়া নয়। আপনি দেখানোর জন্য যদি যিকির করেন, তখন রিয়া হবে।

এক সাহাবীর ছোটবেলায় বাবা মারা গেছেন। তখনো তিনি সাহাবী হননি, কুফর অবস্থায় ছিলেন। চাচার হাতে ভাতিজা লালিত হচ্ছিল, কিন্তু ভাতিজা কোনোভাবে মুসলমান হয়ে গেল। মুসলমান হলে এটা গোপন থাকে না। মেশক যেমন লুকানো যায় না, তদ্রূপ মুসলমান হলে এমনিতেই তা জাহির হয়ে যায়। সেরূপ অনেক বিষয় আছে, যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে যায়। যা-ই হোক, তাঁর মুসলমান হওয়ার বিষয় চাচার কাছে পৌঁছে যায়। চাচা ভাতিজার সব কাপড়চোপড় খুলে বিবস্ত্র করে বের করে দেয়। মা কুফর অবস্থায় ছিল। তার পরও মা তো মা। মা তাকে একটি কাপড় দিল। উক্ত সাহাবী কাপড়টাকে দুই টুকরো করে এক টুকরো দিয়ে সতর ঢেকেছেন। আর এক টুকরো গায়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরের বাইরে গিয়ে খুব জোরে যিকির শুরু করলেন। প্রতিদিন খুব জোরে যিকির করতে থাকেন। একদিন হযরত উমর (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এই লোক যে এত জোরে জোরে যিকির করে? সে তো রিয়াকার। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, রিয়াকার বলো না انه اواه সে মনের জ্বালায় চিৎকার করে যিকির করছে; আল্লাহর প্রেম ও আল্লাহর মুহাব্বতে। ওই সাহাবী মৃত্যুবরণ করলে দাফনের সময় দেখা যায়, হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) লাশ তুলে নিলেন। নবীজি কবরে নেমে বললেন, লাশটা আমাকে দাও। সাহাবীর লাশ কবরে রাখলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ হাতে। দাফন করার পর বললেন, ইয়া আল্লাহ!

তোমার এই বান্দার ওপর আমি সন্তুষ্ট, তুমিও সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এই দু'আ শোনার পর মনে চাচ্ছিল, আহ! আজকের এই লাশটা যদি আমার হতো!

রিয়ার পরিচয় ও বাঁচার উপায় :

শুধু বলা হয় রিয়া। রিয়া কী? বড় করে যিকির করলে রিয়া হয়ে যাবে কেন? এসব শয়তানের ধোঁকা। তোমার কাজ তুমি করো। মানুষ দেখে নিলেই তা রিয়া হয়ে যাবে, তা নয়। বরং দেখানোর জন্য করলে রিয়া হয়।

ফরয নামায আদায় করছি, সেটাও তো রিয়া হতে পারে। নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা কোনো জায়গায় গেলে নামাযের আযান হয়ে গেলে নামায পড়ে নেয়। অথচ ওজু আছে কি না আল্লাহপাকই ভালো জানেন। এ নামাযটা আপনি বলতে পারেন দেখানোর জন্য হয়েছে। তার পরও বলা নিষেধ। বদগুমানির (খারাপ ধারণার) গোনাহ হবে। মুসলমানের প্রতি বদগুমানি করা যাবে না। দেখানোর জন্য ফরয নামায পড়লেও তো রিয়া। আমরা তো ফরয নামায পড়ি, আগে এসে প্রথম কাতারে দাঁড়াই। সেটাও দেখানোর জন্য হলে রিয়া হবে। রিয়া থেকে বাঁচার উপায় কী?

সোজা কথা হলো, আমার কাজ আমি করি, তোমার কাজ তুমি করো। কে দেখছে, কে দেখছে না–এটার সাথে আমার কী সম্পর্ক? এটাতে কোনো রিয়া নেই। দেখানোর জন্য হলে রিয়া।

আচ্ছা, কিছুক্ষণের জন্য মেনেও নিলাম, রিয়া হয়েছে। হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর কাছে এক মুরীদ এসে বললেন–হুজুর, আমি তাসবীহ নিয়া যিকির করি না রিয়ার ভয়ে। মানুষ বলবে, আমি রিয়াকার। জবাবে তিনি বললেন, তুমি তাসবীহ নিয়ে যিকির করো। তুমি মানুষকে দেখানোর নিয়্যাতে করো। শাইখে ত্বরীকত যদি মুহাক্কিক হয়, তখন তাঁর অধিকার আছে–

بمئے سجادہ رنگیں کن گرت پیرے مغاں گوید
کہ سالک بے خبر نبود ز راہ و رسم منزلہا

এটি তো হাফেজ সিরাজী (রহ.)-এর কথা। এগুলো উলামায়ে জাহের কি বুঝবেন? হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী ছিলেন, কাসেম নানুতবী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, আশরাফ আলী থানভী, হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) প্রমুখের পীর। তিনি মুরীদকে বলেছেন, তুমি দেখানোর জন্য করো, তাসবীহ নাও। মুশকিল কিছুই নেই, তুমি দেখানোর জন্য করো। তোমার শায়খ তোমার প্রতি তাওয়াজ্জুহ দেবে। তখন আর রিয়া থাকবে না। ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির নামে 'মুসলিম' শব্দটি ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর আলীগড় থেকে মুসলিম শব্দটি উঠিয়ে দেওয়া হয়। এলাহাবাদে একটি হিন্দু ইউনিভার্সিটি ছিল। তখন সেখান থেকেও হিন্দু শব্দটি উঠিয়ে দেওয়া হলে তার নাম এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি হয়ে যায়।

ব্রিটিশ আমলে হযরত থানভী (রহ.)-এর কাছে এক মুরীদ এসে বলল–হুজুর, আমার ছেলে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। নাস্তিক হয়ে গেছে। এখন আমি কী করি? জবাবে হযরত বললেন, তোমার ছেলেকে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে পড়াও। অথচ সেটা ছিল হিন্দু ইউনিভার্সিটি। তখন মুরীদ কপাল চুলকাতে চুলকাতে ভাবে–এটা তো মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হচ্ছে না তো!

فر من المطر وقر تحت المیزاب

বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ঝর্নার নিচে দাঁড়ানোর মতো হয়ে যাচ্ছে না তো।

قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید

গুণীরা যা বলেন বুঝেশুনেই বলেন।

পীর সাহেবের হুকুম মেনে ছেলেকে এলাহাবাদ হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করিয়ে দিল। ছয় মাস পর এই ছেলে হিন্দুদের সাথে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে মুসলমান হয়ে গেল। এমন মুসলমান হলো, শেষ পর্যন্ত ওলী হয়ে গেল।

বলতে ছিলাম, শায়খ বললেন, তুমি দেখানোর নিয়্যাতে করো। আমি বললাম, দেখানোর নিয়্যাতে করো না, কেউ দেখলে দেখুক। মুহাক্কিক শায়খ বলছেন, তুমি দেখানোর জন্য করো, ছাড়বা না। আল্লাহ তা'আলা যখন তোমার ভেতরে যিকিরের বরকত ও নূর দিয়ে দেবেন তখন রিয়ার বিষাক্ত উপাদান চলে যাবে এবং এই যিকির ইবাদত হয়ে যাবে। আগে রিয়ার সাথে যিকির করা হয়েছিল سيئات ছিল। এখন হবে حسنات। আল্লাহ বান্দার سيئات কে হাসানাত দ্বারা বদলে দেবেন, তখন হাসানাত বেড়ে যায়। يبدل الله سيئاتهم حسنات "আল্লাহ গোনাহকে নেকীতে পরিবর্তন করে দেবেন" চাট্টিখানি কথা নয়।

এ জন্য সব জায়গাতে ইলমের পর যিকির। আগের যুগে মানুষের সময় ছিল। এখন সময় কমে গেছে। হায়াত ছোট হয়ে যাচ্ছে। আগে একটা একটা করা হয়েছিল। এখন একসঙ্গে দুটো করতে হয়। তাই ইলম এবং যিকির একসঙ্গে করো।

আমরা এখানে (মারকাযে) ২২তম বছরে পৌঁছেছি। আমরা প্রথম প্রথম এগুলো করিনি। কেন করিনি। চেষ্টা করা হয়েছে মুরব্বিদের আগের তরীকায় চলার জন্য। আগে ইলম থেকে ফারেগ হও, তারপর যিকিরে লাগানো হবে। কিন্তু ইলম হাসিল করে যিকির করা তো দূরের কথা, ইলম যেগুলো হাসিল করল সেগুলোও শুকিয়ে যায়। ইলম তাজা থাকার জন্য যিকিরের দরকার। যিকির না থাকলে অর্জিত ইলমও শুকিয়ে যায়।

মুরব্বিদের হালকা ও মুরব্বিদের তাওয়াজ্জুহে ধীরে ধীরে আমরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যিকিরও শুরু করাচ্ছি। প্রথমে আসাতিজায়ে কেরামদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এরপর উচ্চতর বিভাগসমূহের তালেবে ইলমদেরকে তারগীব দেওয়া হয়েছে। এরপর দাওরা-মিশকাত শরীফের ছাত্রদেরকে তারগীব দেওয়া হয়েছে। এভাবে উৎসাহ দেওয়ার একটি ধারাবাহিকতা চলার পর এখন সামান্য জোর দেওয়া হচ্ছে। ধীরে

ধীরে কাজ করতে হবে। ইলম আর যিকির সঙ্গে চলবে।

তাবলীগের সাথে জুড়ে থাকো :

বর্তমানে ইলম আর যিকির চলার সাথে সাথে তাবলীগের সাথেও সম্পর্ক রাখতে হবে। তাবলীগের কাজও দেওবন্দিয়াতের তিনটি কাজের একটি। ইলম, যিকির, দাওয়াত ও তাবলীগ। ইলম ও যিকির করেন। দাওয়াত ও তাবলীগে না গেলে অসুবিধা নেই, কিন্তু বিরোধিতা করবেন না। কেননা দাওয়াত ও তাবলীগ দেওবন্দিয়াতের একটা অঙ্গ। আপনি নিজেকে দেওবন্দী দাবি করবেন, আর তাবলীগের বিরোধিতা করবেন, এটা কেমনে হয়? হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) একদিন তাঁর মজলিসে বলেছিলেন, (যা আমি নিজের কানে শুনেছি।) "ভাই! তোমাদেরকে আমি বলছি না যে, তোমরা তাবলীগে যাও, এমন তো না যে, তাবলীগ ফরযে আইন। কিন্তু এ কথা অবশ্যই বলব, তাবলীগের বিরোধিতা করো না। কারণ যদি তুমি বিরোধিতা করো, তবে ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে যাওয়া খাতরার মধ্যে থাকবে।" এ কথা বলেছেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি দেওবন্দী আলেম। যেদিন তিনি এই কথা বললেন, এর আগে বা পরে আমি একটা দরখাস্ত লিখেছিলাম হযরতের নিকট। তাতে আমি লিখলাম, হুজুর! আমি এত বছর ধরে দ্বীনি মাদরাসার সঙ্গে জড়িত, মাদরাসার খেদমতে আছি। এত মাস হতে আমি খানেকাহে আসা পর্যন্ত চিল্লাতে ছিলাম। মিরাঠে ছিলাম, মেওয়াতে, সাহারানপুরে ছিলাম। এই মেহনতের পর আমার মন চাচ্ছে, বাকি হায়াতটা তাবলীগের মেহনতে কাটিয়ে দিই। আমার ধারণা ছিল, হযরত খুশি মনে এজাজত দেবেন। বলবেন ঠিক আছে, করো। কিন্তু দিকনির্দেশনামূলক যে জবাব তিনি আমার প্রতি লিখলেন, তা সকলের জন্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখলেন,

ہرگز نہیں تعلیم کے ساتھ لگے رہو تبلیغ کے ساتھ جوڑے رہو۔

"কখনো না, তা'লীমের সাথে লেগে থাকো, তাবলীগের সাথে জুড়ে থাকো।" তাঁর এই জবাব নোট করে রাখা দরকার।

হক্কানী পীরের পরিচয় :

উল্লিখিত তিনটি কাজের নাম হলো দেওবন্দিয়াত। আমাদের দেশে কিছু পীর সাহেবান আছেন, যাঁরা খুব যিকির করান। চিৎকার-ফুৎকার করে যিকির করান। যিকিরের বদনামি করবেন না। যিকির তো আল্লাহর। তিনি কোন নিয়্যাতে করছেন তিনি জানেন, আর আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এতে আমাদের কী। কিন্তু দেখতে হবে, পীর সাহেব আলেম কি না? যদি আলেম হন, হক্কানী কি না? হাক্কানী আলেমের পরিচয় দিলাম ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা আর বিশ্বাস নিয়ে তিনটি কাজ করতে হবে। ইলম, যিকির ও তাবলীগ। তাবলীগ করা মানে এর সাথে জুড়ে থাকা, সম্পর্ক রাখা। যদি পীর সাহেব আলেম হন ও কাজের সাথে জড়িত থাকেন তাহলে উনি দেওবন্দী ও হক্কানী। আর যদি পীর সাহেব আলেম না হন। এরূপ পীর থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে। সমালোচনা করার দরকার নেই। আর যদি পীর সাহেব আলেম হন, শুধু পড়ালেখার কথা বলেন, যিকিরের কথা নিষেধ করেন, তাবলীগের বিরোধিতা করেন, তাহলে তিনি পীর কেমনে হবেন? উলামায়ে জাহের হতে পারেন, তিনি হাক্কানী আলেমের মধ্যে পড়েন না। আলেম, যিকির করেন, কিন্তু দাওয়াত ও তাবলীগের বিরোধিতা করেন। তিনিও হাক্কানী আলেম নন। এই তিনটি কাজ নিয়েই হাক্কানী আলেম। দেওবন্দিয়াত এটাই। যে সমস্ত পীরেরা যিকির তো খুব চিৎকারসহ করেন, কিন্তু এদিকে আকীদা দুরস্ত নেই, দ্বীনি ইলমের সঙ্গে জড়িত নেই। যিকির-আযকার যত করুন, হক্কানী জামাআতের মধ্যে থাকবেন না। আর এগুলো আছে কিন্তু তাবলীগের বিরোধিতা করেন তিনিও হাক্কানী জামাআতে থাকবেন না। কাসেম নানুতবী (রহ.) মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.) প্রমুখ যে কাজ করেছেন সে কাজ আপনি করুন, হক্কানী থাকবেন। ইলম ও যিকির নিয়ে চলেন, দাওয়াত ও তাবলীগ নিয়ে চলেন।

তাবলীগের দুশমন :

তদ্রূপ তাবলীগী জামাআতের কোনো কোনো ভাই যদি মাদরাসার বিরোধিতা করে, মাদরাসার দরকার নাই বলে, সে বদদ্বীন। তার কিসের তাবলীগ? সে মূর্খ। যারা বলে মাদরাসার দরকার নেই, সে তো মূর্খ, আবার যারা বলে মাদরাসার দরকার আছে; কিন্তু তার মতের মাদরাসা। এটাও মূর্খতা। মাদরাসা মাদরাসার গতিতে চলবে। তাবলীগের মতো করে মাদরাসা চলবে না। তাবলীগের যে সমস্ত ভাই মাদরাসার প্রতি কটাক্ষ করে, এরা অত্যন্ত গোমরাহ-বদদ্বীন। এদের কোনো তাবলীগ নেই। এদের তাবলীগী জামাআতে রাখা তাবলীগী জামাআতের বদনামির কারণ। এরা আসলে তাবলীগকে নষ্ট করার জন্য সেখানে ঢুকেছে। যে রকম আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ইহুদি মুসলমান বেশে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য মুসলমানদের মাঝে ঢুকেছিল। বুঝতে হবে, ওই ধরনের লোকই আগে আগে বলবে অমুক মাওলানা তাবলীগের বিরোধী, অমুক আলেম তাবলীগের সমালোচনা করেন ইত্যাদি

সুতরাং যারা মাদরাসাকে কেন্দ্র করে কটাক্ষ করে, তারা বদদ্বীন তারা তাবলীগী না। যিকির যারা করে, ইলম ও যিকির যাদের একসাথে আছে, কোনো তাবলীগী ভাই যদি সেই রকম যিকিরের বিরোধিতা করে, সেও তাবলীগী না। তাবলীগী হওয়ার জন্য ইলম ও যিকির লাগবে। আকীদা ঠিক করতে হবে। কোরআন শরীফ শুদ্ধ পড়তে হবে। যার কোরআন অশুদ্ধ, আকীদা ঠিক নেই, আবার যিকিরকারী এবং মাদরাসার বদনামি করে, সেরূপ লোকের কিসের চিল্লা? চিল্লা দাও, ধীরে ধীরে আকীদা দুরস্ত করো, চিল্লা দাও, ধীরে ধীরে কোরআন শরীফ শুদ্ধ করো।

ইনশাআল্লাহ! কামিয়াব হবে।
যারা এগুলো না করে মাদরাসার বদনামি করে, কোরআন শুদ্ধ করে না, আকীদা ঠিক করে না, ওই লোকের ছয় নম্বর মুখস্থ করলে কী লাভ হবে? কথা কম বলো, কাজ বেশি করো। কেউ চিল্লা দিয়ে যখন এলাকায় ফিরে এসে বৃহস্পতিবার দিন মসজিদে যাবে, সবাই ওর দিকে তাকাবে। আমাদের অমুক মাশাআল্লাহ তিন চিল্লা দিয়ে এসেছেন। তাঁকে আজকে বয়ান করতে দেওয়া হোক! তাঁকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। এখন তিনি যদি কিছু মুখস্থ করে না যান লোকেরা কী বলবে, বলুন তো? তিনি তিন চিল্লার মধ্যে কিসের মেহনত করেছেন? ৬ নম্বর (অর্থাৎ ১ নম্বর ঈমান-ইয়াকীন ২. নামায ৩. ইলম ও জিকির ৪. ইকরামুল মুসলিমীন ৫. সহীহ নিয়্যাত, ৬. দাওয়াত ও তাবলীগ) মুখস্থ করেছে। অথচ কোরআন শরীফ শুদ্ধ করেনি। এর দরকারও বোঝেনি। সে চিন্তা করেছে, বাড়িতে গেলে আমাকে কিছু বলার জন্য দাঁড় করিয়ে দিলে কী বলব? এর জন্য মেহনত করেছে। ঈমান-ইয়াকীনের কিছু কথা শিখছে। যেমন : لا اله الا الله محمد رسول الله এরপর নামায। নামায বেহেশতের চাবি। না পড়লে শাস্তি হবে, পড়লে সওয়াব হবে। এরপর ইলম ও যিকির। ফাজায়েলের ইলম মসজিদে মাসায়েলের ইলম আলেমদের কাছ থেকে শিখবে, এটা ছিল হেদায়াত। যিকির হলো, সকালে তিন তাসবীহ ও বিকালে তিন তাসবীহ পড়া। اكرام المسلمين মুসলমানকে সম্মান দিতে হবে। বড়কে ইজ্জত করতে হবে ছোটকে দয়া করতে হবে। যতটুকু শিখেছে, ততটুকু বলবে। সবাই বাহবা দেবে, তারপর বলবে আমি তিন চিল্লা দিয়েছি আল্লাহ আমার তিন চিল্লা কবুল করুন। এটা তসহীহে নিয়্যাত। আপনারা কে কে আছেন চিল্লা দেওয়ার জন্য, এভাবে তাশকীল শুরু হয়ে যাবে। তাশকীল করতে মসজিদে শোর হয় কথাবার্তা হয়, এগুলো দ্বীনের কথা মসজিদে হচ্ছে। দ্বীনের কথা মসজিদে যেহের বা জোরে শোরে উচ্চ আওয়াজে হয়, এটা তো জায়েয হয়, আর আল্লাহ-আল্লাহ যিকির বড় বড় করে বললে নাজায়েয হয় (?) এটা কোন ধরনের কথা? মসজিদে ঝগড়া করতে পারবা, মসজিদে চিল্লাচিল্লি করতে পারবা, মসজিদে কথাবার্তা বলতে পারবা, বক্তৃতা দিতে পারবা, বক্তৃতায় সবাই সমস্বরে বড় আওয়াজে ঠিক ইত্যাদিও বলতে পারবা, কিন্তু তেলাওয়াতে কোরআন বড় করে করতে পারবা না। বড় করে তেলাওয়াত করলে বলা হচ্ছে, কেন বড় করে পড়া হচ্ছে? আল্লাহ আল্লাহ যিকির করলে বলা হয় কেন আওয়াজ করা হচ্ছে? এরূপ বলা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়।

শেষ কথা :

এখন আমার সর্বশেষ কথাটি বলতে চাই। আপনারা সাহেবে ইলম, দু-একটি কিতাব দেখলেন, তাতে মসজিদে رفع الصوت بالذكر حرام লেখা দেখে নাচা আরম্ভ করলেন। কোথাও দেখলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কিছু মানুষকে মসজিদে যিকির করতে দেখে বলছেন–বিদ'আতী! বাইরে যাও। মসজিদে যিকির বিল যেহের জায়েয নেই। এই হাদীসের হাকীকত কী? আপনি খবর নিয়েছেন? আপনারা উলামায়ে কেরাম চাহে মুদাররিস হোন বা শিক্ষানবিশ হোন, বড় জামআত আপনাদের। আপনারা এ ব্যাপারে তাহকীকের ওপর থাকবেন। আমাদের দেওবন্দী উলামায়ে কেরাম নাজায়েয কাজ করতে পারেন না। এ কথা নিশ্চয়ই মেনে নিতে হবে। দেওবন্দী উলামায়ে কেরাম যিকির বিল যেহের মসজিদে করেছেন। যদি কোনো কিতাবে তার বিপরীত পান হয়তো রদ করেন অথবা বিশ্লেষণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস সম্পর্কে হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) বলেন, বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের হাদীস দিয়ে আমি দলিল পেশ করছি। বোখারী ও মুসলিমের হাদীসের বিপরীতে দারেমীর হাদীসের কী স্থান। ওই হাদীস যেটা موقوف যেই হাদীসের রাবী متفرد ওই হাদীসের অবস্থান কতটুকু। তার পরও বলেন, হ্যাঁ, যে যিকিরে যেহেরের কারণে অন্যের নামাযের ক্ষতি হয়, ঘুমন্ত ব্যক্তির ক্ষতি হয়, সেই রকম যিকির বড় আওয়াজে করবেন না।
কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ذكر مفرط (যিকিরের আওয়াজে সীমালঙ্ঘন) নিষেধ। হযরত থানভী (রহ.) বলেন, যিকরে জলীর প্রত্যেক প্রকারই জায়েয। এমনকি কোনো মুরীদের শায়খ যদি جهر مفرط করতে বলে, তাও করতে পারবে। সাধারণভাবে جهر مفرط আমরাও মানা করি। কিন্তু হযরত থানভী (রহ.) বলেন, পীর যদি বলেন مفرط যিকির করো, চিল্লাচিল্লি যিকির করো, তাহলে করতে পারবে। তবে শায়খ মুহাক্কিক হতে হবে। মুহাক্কিক শায়খ যদি চিল্লাচিল্লি জিকির করতে বলে, করো। এসব কথা আপনাদের কিতাবে আছে।
আমি যে কথাগুলো আপনাদের সামনে বললাম, তা আপনারা নোট করেন। কোথাও যদি এ ধরনের কথার সম্মুখীন হন, তবে যেন মজবুত হয়ে তার মোকাবেলা করতে পারেন لاتخافون فى الله لومة لائم "হক কথা বলতে কাউকে ভয় করবেন না। সে তাবলীগকে শত্রু বলুক, সে ওহাবী বলুক, জঙ্গি বলুক, কোনো পরওয়ার প্রয়োজন নেই। তাবলীগওয়ালাকেও বলো, যিকিরে যেহের মানা করবেন না। বায়আত মুরীদীকে নিষেধ করবেন না। যারা পীর আবার তাবলীগের বিরোধিতা করে তাদেরকে বলুন, আপনারা আপনাদের কাজ করুন, তাবলীগের বিরোধিতা করবেন না। কারণ সেটা মূর্খতা। সে রকম পীর থেকে দূরে থাকুন।
খুব খেয়াল করবেন দালায়েল নিয়ে আপনাকে চলতে হবে। আমি এ জন্য বলছিলাম, বর্তমান উপমহাদেশে আমরা ফিকহ পড়ে মাসআলা-মাসায়েল বলি। কেউ কোনো ধরনের অভিযোগ বা

বাধার সম্মুখীন হতো না। এখন বলা হয়, হুজুর হাদীস বলেন। বলুন, এখন কী করবেন? এটা একটা রোগ। আপনার কাছে হাদীস তলব করছে। আপনি ফকীহ ফিকহের কিতাব সব মুতালাআ করেছেন; কিন্তু হাদীস জানেন না। ফতোয়ায়ে শামীতে আছে বললে মানছে না। এ জন্য আগেভাগে বলে দিচ্ছি, সবার কাছে ফিকহের গুরুত্ব কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। ফিকহ ছাড়া ইসলামী হুকুমত থাকতে পারবে না। যদি কারো বুঝে না আসে, বলতে হবে সে অবুঝ। ফিকহের গুরুত্ব কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কারণ কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম থাকবে, কুরআন থাকবে, হাদীস থাকবে। সাথে সাথে ফিকহের গুরুত্বও থাকবে। তবে এখন ঘরের লোকও হাদীসের দলিল খুঁজছে। এ জন্য এখন হাদীসের ওপরও আসতে হবে।

এক মৌলভী সাহেব এক হাদীস পেশ করেছেন নামাযের ব্যাপারে। কিন্তু একজন আফগানি মুসলমান বলেন, মাওলানা! مارا قول ابی حنیفہ باید نہ کہ قول رسول ﷺ তখন ফিকহের জোয়ার ছিল। অর্থাৎ হাদীস তুমি তো বুঝবা না ইমাম আবু হানীফা বুঝেছেন। আবু হানীফা হাদীস বুঝে কী বলেছেন, সেটা বলো। তাই আপনাদেরকে হাদীসের ওপর মেহনত করতে হবে। আপনাদেরকে প্রতিটা জিনিসের ওপর হাদীস পেশ করতে হবে।

এক লোককে কয়েক দিন আগে আমি বললাম, তুমি হাত সিনার ওপর কেন বাঁধো? কোনো হাদীস আছে তোমার কাছে? সে বলে, হুজুর! মক্কা শরীফ গিয়েছিলাম, সেখানে সিনার ওপর হাত বাঁধতে দেখেছি, তাই বাঁধি। আমি বললাম, একজন হাফেজ আলেম হয়ে তোমার এ ধরনের কথা বলা কত বড় মূর্খতা। বললাম–দেখো, আমরা এত দিন মুখ খুলিনি। এখন মুখ খুলছি, সিনার ওপর হাত বাঁধার কোনো হাদীস নেই। যদি কেউ হাদীস আছে বলে দাবি করে, সেই হাদীস সঠিক নয়। তার পরও সিনার ওপর হাত কেন বাঁধবে? নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদীস সহীহ। আমরা চ্যালেঞ্জ করতেছি। সেই লোক আমাকে বলল, হুজুর! এই কথাগুলো পরস্পরে বসে আলোচনা হতে পারে না? আমি বললাম, অবশ্যই হতে পারে। এ জন্য আমি প্রস্তুত আছি, তাদেরকে প্রস্তুত করতে পারো? সে বলল, আমি অবশ্যই চেষ্টা করব। আমি বললাম, করো। সে বলল, কোথায় বসলে ভালো হয়? আমি বললাম, যেখানে কিতাবের স্তূপ আছে, সেখানে বসো। কিতাব কোথায় আছে বলো, ইউনিভার্সিটিতে কিতাবের স্তূপ আছে? বসুন্ধরা মারকাযে কিতাবের ঢের আছে। তুমি এখানে বসো।

বলছিলাম! আমরা মুখ খুলিনি। এখন মুখ খুলছি। হাত কোথায় বাঁধবা না বাঁধবা, নামাযের সাথে কী সম্পর্ক? হাত যদি একেবারেই না বাঁধো, কী অসুবিধা? হাত সিনাতে বাঁধলেও কী, নাভির নিচে বাঁধলেই কী? এটা নিয়েও মানুষ আলোচনা করে! এসব কিছু কুচক্রীমহল ইসলামকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য করছে। ডা. জাকির নায়েকের মতো লোক, টেলিভিশনের মৌলভীদের মতো লোক এ সমস্ত কথা বলে মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে, ইসলামকে ধ্বংস করছে।

এ কারণে আমি তোমাদেরকে বলি ফিকহ পড়ো। ফিকহের গুরুত্ব শেষ হবে না কোনো দিন। কিন্তু এখন হাদীস তলব করে, হাদীস দিয়ে জবাব দিতে হবে তোমাকে।

ইসলামী অর্থনীতির জোয়ার ঠেকাতে পারবে না। মাদরাসায় বসে বসে সুদি ব্যাংক আর ইসলামী ব্যাংক একই বলার কী অর্থ আছে? মাঠে এসে বলেন। আপনাকে যদি ওরা ধরে ইসলামী ব্যাংক আর সুদি ব্যাংক যেহেতু বরাবর বলছেন, সেহেতু আমাদেরকে ব্যবসা করার একটা সুদমুক্ত ফর্মুলা দেন। তৈরি হোন, আমরা সেরূপ ফর্মুলা দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে বলছি। যদি বর্তমান ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুদি ব্যাংকের মতো হয় তাহলে সুদি ব্যাংকের মতো না হওয়ার জন্য কী ফর্মুলা হবে, সেটা জোগাড় করে দিন। মুখে বললে হবে নাকি, এটা ওয়াজ নাকি? এটা পীরগিরি নাকি? ইলম নিয়ে কথা বলতে হবে।

এখন ইসলামী অর্থনীতির জোয়ার। এই জোয়ারের মধ্যে আপনারা ভেসে যাবেন কি না? আর ধর্মীয় শিক্ষায় অনভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষিতরা ইসলামী ব্যাংকের সাইনবোর্ড দিয়ে হারামকে হালাল বলে চালিয়ে দেবে কি না? যখন উলামায়ে কেরাম এ জোয়ারের মধ্যে ভেসে যাবে, তখন ইংরেজি শিক্ষিতরা যা মনে চায়, তাই করবে। এ সুযোগ দেওয়া যায় না। ইসলামী অর্থনীতির যে জোয়ার এসেছে, তা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে আপনাদেরকেই মাঠে নামতে হবে।

হাদীসের মাধ্যমে মাসায়েল বলার কথা বললাম। এটা কোনো জটিল বিষয় নয়। শুধু নামাযটাকে হাদীসের মাধ্যমে শিখে নেন। ষড়যন্ত্রকারীদের মোকাবিলা করা যাবে।

ইসলামী অর্থনীতিও এত মুশকিল বিষয় নয়, শুধু পদ্ধতিটা শিখতে হবে। এর জন্য আপনারা তৈয়ারি নেন।

মাশাআল্লাহ! এমন এমন তালেবে ইলম মারকাযে ইক্তেসাদে আসছে–একজন আলেম দুই বছর শিক্ষকতা করার পর ভর্তি হয়েছে। আমার তো মনে চায় তার মতো প্রত্যেকে অনুধাবন করুক। "ইসলামী অর্থনীতি চর্চা এখন সময়ের দাবি।" এই ছেলে বলল, আমার মনে হলো ইসলামী অর্থনীতি ছাড়া কোনো মাদরাসায় পড়ালে লাভ নেই। এ কথাগুলো আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঢেলে দিক। আমীন

যিকিরের ব্যাপারে কিছু কথা সংক্ষিপ্তভাবে বললাম। আশা করি, মোটামুটি সব জরুরি বিষয় এসে গেছে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে বোঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

(মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত রহ. থেকে সংগৃহীত)

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

উলামায়ে কেরাম নবীগণ (আ.)-এর ওয়ারিস

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

(মিরপুরের রূপনগরের আবাসিক এলাকায় গত ১৪ ই জানুয়ারি উলামাদের জোড়ে তাবলীগ জামাত, বিশ্ব ইজতেমা এবং তাবলীগের মুরব্বি মাওলানা সাদ সাহেব কান্ধলভী (দা.বা.) সম্পর্কে চলমান সংকটের ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করেন মুহিউস্‌সুন্নাহ শাহ সাইয়্যেদ আবরারুল হক হারদূঈ (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-এর প্রধান মুফতী ও শায়খুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক (দা.বা.)।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে কারীমে চার জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম চারটি দায়িত্ব পালন করার দ্বারা দ্বীন কায়েম করেছেন। প্রথম পারা ১৯ নং পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় পারার ২ নং পৃষ্ঠায়, চতুর্থ পারার ১০ম পৃষ্ঠায় এবং ২৮ পারায় সূরা জুমু'আতে।

প্রথম দায়িত্ব :

يتلو عليهم أياته উম্মাতের কাছে কোরআনের আয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এর দ্বারা সকল মুফাসসিরীনে কেরাম দাওয়াত ও তাবলীগ প্রমাণ করেছেন।

দ্বিতীয় দায়িত্ব :

يزكيهم আত্মশুদ্ধির মেহনত করা। অন্তরের ১০টি রোগের চিকিৎসা করা, আর ১০টি গুণ অর্জন করা। একে বলা হয় আত্মশুদ্ধি, তাযকিয়ায়ে বাতেন, তারবিয়াত।

তৃতীয় দায়িত্ব :

يعلمهم الكتاب কোরআনের তা'লীম দেওয়া। কোরআনের হুকুম-আহকাম শেখানো।

চতুর্থ দায়িত্ব :

الحكمة নবীজির সুন্নাত শেখানো। যত দূর সম্ভব হাতে-কলমে শেখানো। কারণ নামায ফরয হওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের সূরতে জিবরাইল (আ.)-কে পাঠানো হয়েছে হাতে-কলমে কাজ দেখানোর জন্য। নবীজি (সা.)-কে জিবরাইল (আ.) হাতে-কলমে ওজু শিখিয়েছেন। এমনকি ওজু করার পর লজ্জাস্থান বরাবর কাপড়ের ওপরে কিছু পানি ছিটিয়ে দিতে বলেছেন, যাতে ইবলিশে ওয়াসওয়াসা না দিতে পারে যে, প্রস্রাবের ফোঁটা মনে হয় লেগে আছে!

নবীজি মেরাজের পরে যোহরের পর থেকে দুই দিনে দশ ওয়াক্ত নামাযের হাতে-কলমে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। আর নবীজি বাকি যিন্দেগী সাহাবায়ে কেরামকে ট্রেনিং দিয়েছেন।

আম্বিয়া (আ.)-এর দায়িত্ব কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মোট চারটি প্রমাণিত হয়। **এক.** দাওয়াত ও তাবলীগ। **দুই.** তাযকিয়া। **তিন.** কোরআনের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেওয়া। **চার.** সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়া।

আর আমাদের ব্যাপারে নবীজি (সা.) ঘোষণা করেছেন, আলেমরা আমার ওয়ারিস। কত লোকের প্রশংসা নবীজি (সা.) করলেন হাজী সাহেব, গাজী সাহেব, মুজাহিদে ইসলাম, তাযিরুস সদূক [সৎ ব্যবসায়ী!সহ অনেকের প্রশংসা নবীজি (সা.) করেছেন। কিন্তু কাউকেই নবীজি (সা.) ওয়ারিস বলেননি। একমাত্র উলামায়ে কেরামকে ওয়ারিস বলেছেন।

এতদ্বসংশ্লিষ্ট হাদীস আমাদের সকলেরই জানা আছে,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

নিশ্চয়ই উলামায়ে কেরাম আম্বিয়া (আ.)-এর ওয়ারিস। আম্বিয়া (আ.) দিনার-দিরহামের ওয়ারিস বানান না। বরং তাঁরা তো ইলমের ওয়ারিস বানান। যে তা আঁকড়ে ধরল, সে একটি বড় প্রাপ্তি লাভ করল! (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস নং-২১৭১৫)

প্রথমে বুঝতে হবে আমাদেরকে ওয়ারিস কেনো বললেন? ওয়ারিস না বলে 'খুলাফাউল আম্বিয়া' [আম্বিয়া আ. -এর খলিফা বা প্রতিনিধি], অথবা 'নায়েবুল আম্বিয়া' [নবীগণের স্থলাভিষিক্ত], বা 'কায়িমুন মাকামাল আম্বিয়া' [নবীগণের স্থলাভিষিক্ত] কেন বললেন না?

ওয়ারিস বলার মৌলিক কারণ বা ফায়দা দুটি :

এক নম্বর ফায়দা.

দুনিয়াতে কারো ওয়ারিস হতে গেলে মৃতের সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হয়। যেমন আমি তার ছেলে, আমি তার ভাই.. ইত্যাদি। সম্পর্ক উল্লেখ না করে মীরাছ দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। যেমন কারো মৃত্যুর পর কেউ এসে বললো, আমি তার গ্রামের লোক, আমি তার সাথে একই পার্টি করতাম, তাই মীরাছ নিতে এসেছি। এ ধরণের কথা

কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না।

এখানে নবীজি (সা.) ইশারা করছেন, যদি কেউ নিজেকে আলেম দাবী করে, তবে সে নবীজি পর্যন্ত সম্পর্ক বয়ান করতে পারে কি না? তার উস্তাদ কে? তার উস্তাদ কে? তার উস্তাদ কে? এভাবে আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত সে সম্পর্ক বয়ান করতে পারে কি না? এটা আগে তালাশ করতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা আমাদের প্রত্যেকটা কথার সনদ নবীজি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো। কেননা, আমাদের উস্তাদগণ তাদের সনদ তাদের থেকে নিয়ে ইমাম বুখারী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আমাকে যারা বুখারীর ইজাযত দিয়েছেন তারা হলেন, শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক সাহেব রহ., মুফতী আব্দুল মুঈয সাহেব রহ., দেওবন্দের আনজার শাহ কাশ্মিরী রহ., সিলেটের নুরুদ্দীন গওহরপুরী রহ., বসুন্ধরার মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব রহ., যাত্রাবাড়ির মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব দা.বা.,হাকিম আখতার সাহেব রহ. এর সাহেবযাদা মাওলানা মাযহার সাহেব দা.বা.।

এরা প্রত্যেকে তার থেকে নিয়ে ইমাম বুখারী পর্যন্ত সনদ বলে দিয়েছেন। আর ইমাম বুখারী থেকে নিয়ে নবীজি (সা.) পর্যন্ত সনদ তো বুখারীতেই বলা আছে। একই কথা মুসলিম শরীফসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবের ব্যাপারে প্রযোজ্য।

সারকথা, ওয়ারিস দাবী করলে প্রথমত নবীজি (সা.) পর্যন্ত সম্পর্ক বয়ান করতে হবে। এটা একমাত্র ইসলামের বৈশিষ্ট্য। ইয়াহুদী, খ্রিষ্টানসহ অন্য কোনো ধর্মের কোনো আলেম তাদের একটা কথাকে তাদের নবী বা ধর্মগুরু পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।

ওয়ারিস বলার একটা ফায়দা এটা হয়ে গেলো যে, আল্লাহ তাআলা উম্মাতকে নিষেধ করলেন যে, কেউ আলেম নাম নিয়ে আসলেই তোমরা তার বয়ান শুনবে না; বরং আগে দেখো যে, তার সনদ আছে কি না? এর দ্বারা মওদূদী, জাকির নায়িক প্রমুখ সবাই বাদ পড়ে গেছে। কেননা, তাদের কারো কোনো সনদ নেই।

দুই নম্বর ফায়দা :

যার ওয়ারিস হয়, তাকে বলা হয় মুরিস। নিয়ম হলো, ওয়ারিস যে হবে সে মুরিসের সকল সম্পত্তির মধ্যে ওয়ারিস হবে। যেমন মুরিস জমি রেখে গেছে, বিল্ডিং রেখে গেছে, টাকা রেখে গেছে। ভাই বোন সকলেই সকল সম্পত্তির মধ্যেই ওয়ারিস হবে। হ্যাঁ, বণ্টন হওয়ার পর মালিকানা ভাগ হবে। আমাদেরকে যখন নবীজির ওয়ারিস বলা হলো, তখন নবীজি যত কাজ রেখে গেছেন, সকল কাজের ওয়ারিস আমরা। তাবলীগেরও ওয়ারিস, তাযকিয়ারও ওয়ারিস, তালীমে কুরআনেরও ওয়ারিস, তালীমুস সুন্নাহরও ওয়ারিস। চারটি কাজেরই আমরা ওয়ারিস। নবীজির ওয়ারিস হিসাবে চারটা কাজই আমাদের দায়িত্ব।

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) কোত্থেকে সৃষ্টি হয়েছেন? দেওবন্দ থেকে। দাওয়াত ও তাবলীগ দেওবন্দের অবদান। হযরত ইলিয়াস (রহ.)-কে মেওয়াতে পাঠিয়েছিলেন হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)। কাজেই দাওয়াতুল হকের মুরব্বি যেমন থানভী, দাওয়াত ও তাবলীগেরও মুরব্বি থানভী (রহ.)।

একবার কিছু লোক চেয়েছিল তাবলীগে নাহি আনিল মুনকার যোগ করতে। এতে দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন তারা থানভী (রহ.)-এর কাছে এলে তিনি বললেন, 'এটা যোগ করা যাবে না; কারণ তাবলীগের কাজ হচ্ছে সারা দুনিয়ায় দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া যে, ইসলাম একমাত্র মুক্তির ধর্ম। পুরো দ্বীন পৌঁছানোর দরকার নেই। তাহলে তোমরা পুরো দুনিয়াতে যেতে পারবে না। বাধাগ্রস্ত হবে।

তখন থানভী (রহ.) নাহি আনিল মুনকারের কাজটি বিশেষভাবে দিয়েছিলেন মজলিসে দাওয়াতুল হক কে। এখানে শুধু সুন্নাতে মশকই করানো হয়, এমন নয়; বরং এখানে গোনাহে কবীরা কী কী? তাও বলে দেওয়া হয়, যাতে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা সম্ভবপর হয়।

যেমন সুলাইমান (আ.)-এর জমানায় জাদুর তা'লীম দেওয়া হতো। কেন দেওয়া হতো? জাদু করার জন্য নয়; বরং এটা দেখানোর জন্য যে, এগুলো কুফরী কথা, এগুলো করা যাবে না। তেমনি দাওয়াতুল হক গোনাহে কবীরা তা'লীম করে, গোনাহে কবীরা করার জন্য নয়; বরং তা থেকে বাঁচার জন্য।

সুতরাং আমাদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগেও সময় দিতে হবে, তাযকিয়ার জন্য হক্কানী পীর-মাশায়েখের খানকাতেও শরীক হতে হবে, কিতাবের মশক তো মাদরাসায় হচ্ছে, আর দাওয়াতুল হকের মাধ্যমে আমলী মশকের দ্বারা তা'লীমে সুন্নাহও করতে হবে। এ সবগুলো কাজ করতে হবে একই সঙ্গে। কেননা সবগুলোই নবীগণের রেখে যাওয়া মিরাছ।

আলহামদুলিল্লাহ! এখন আলেমরা যেভাবে সতর্ক হয়েছে, এটা ধরে রাখতে হবে। এটা যদি আমরা আগের থেকে ধরতাম, তাহলে হয়তো (বর্তমান দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে) "ইত্তেহাদুল জুহালা" [অজ্ঞ লোকদের ঐক্য] কায়েম হতো না।

এখন আমরা একদিকে খেয়াল একটু কমিয়ে দিয়েছি, তাই অনেক বড় জাহেল কিয়াদত হয়ে গেছে এবং তারা আর আলেমদের মানছেই না। এ জন্য আল্লাহ

তা'আলা আমাদের যে সহীহ বুঝ দিয়েছেন এর ওপর বাকি যিন্দেগী কায়েম থাকতে হবে এবং ছাত্র-শিক্ষক নিয়ে এ কাজকে সহীহভাবে ধরে রাখার জন্য যা কিছুর দরকার, তা করতে হবে। এ কাজ থেকে সরে থাকা যাবে না। কোনো ব্যক্তির জন্য আমরা তাবলীগ করিনি, আর কোনো ব্যক্তির জন্য তাবলীগ আমরা ছাড়বও না।

বর্তমান দাওয়াত ও তাবলীগের মুরব্বি মাওলানা সাদ সাহেব কান্ধলভী (দা.বা.)-এর সাথে আমাদের উলামায়ে কেরামের ব্যক্তিগত কোনো বিরোধ নেই। সমস্যা হচ্ছে, তিনি কিছু বক্তব্য দিয়েছেন, যা সরাসরি কোরআন-সুন্নাহবিরোধী। কোনো অবস্থাতেই কোরআন-সুন্নাহ তা সমর্থন করে না। কাজেই সংগত কারণেই সে সকল বক্তব্যের বিরোধিতা করা এবং দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে জুড়ে থাকা ধর্মপ্রাণ ভাইদের ঈমান-আকীদা এবং আমলের সহীহ রাহনুমায়ী করা উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হয়ে গেছে।

আমরা মাওলানা সাদ সাহেবের আপত্তিকর বক্তব্যসমূহের মধ্য থেকে কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরছি :

১. তিনি বলেছেন যে, কোরআন না বুঝে পড়া যাবে না। এ বক্তব্য ছিল জনাব মওদুদী সাহেবের। অথচ হাদীসে পাকে পরিষ্কার এসেছে যে আলীফ, লাম, মীম –যার অর্থ মানুষ বলতে পারবে না। তা পড়লেও ৩০টি নেকী হবে!

আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, কিয়ামতের আগে কিছু বাতিল ফেরকার লোক আসবে যারা বলবে যে, তোতার মতো কোরআন পড়লে সওয়াব হবে না। তাই আগেই তার দাঁতভাঙা জবাব হাদীসে দেওয়া হয়েছে।

২. তিনি বলেছেন যে, মুসা (আ.) মারকায ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এ জন্য তাঁর উম্মত বনী ইসরায়েল গোমরা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই মারকায ছেড়ে যাওয়া ঠিক নয়...!! আল্লাহ তা'আলা মাফ করুন! কত বড় মারাত্মক ভুল এটা। মুসা (আ.) একজন সম্মানিত রাসূল ছিলেন। যাঁকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাওরাত কিতাব আনার উদ্দেশ্যে তূর পাহাড়ে গিয়ে ই'তিকাফ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তূর পাহাড়ে যাওয়া যদি ভুল হয়ে থাকে, তবে সে ভুলের আদেশ কি তাহলে আল্লাহ তা'আলা করেছেন...!!

৩. তিনি বলেছেন, 'হেদায়াত যদি আল্লাহর কাছে হতো, তাহলে নবী পাঠানোর কী দরকার ছিল?" প্রশ্ন হলো, নবীগণের হাতেই যদি হেদায়াত থাকে, তবে নবীজির প্রিয় চাচা আবু তালেব কেন হেদায়াতপ্রাপ্ত হলেন না?

সঠিক কথা হলো, নবীগণের দায়িত্ব কেবল সঠিক রাস্তা দেখানো, আর মঞ্জিলে মাকসূদে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর হাতে। আর মঞ্জিলে মাকসূদেও পৌঁছে দেওয়াই প্রকৃত হেদায়াত!

৪. তিনি বলেছেন, একমাত্র মসজিদভিত্তিক দাওয়াতের কাজ হলো দ্বীনি কাজ। এর বাইরে যা হচ্ছে, এগুলো একটাও দ্বীনি কাজ নয়। মাদরাসার কোনো পাত্তাই তাঁর কাছে নেই! অথচ আমি আমার আলোচনার শুরুতে বলে এসেছি যে মাদরাসা হলো দুই নববী দায়িত্ব 'তালীমুল কিতাব এবং তালীমুসসুন্নাহ'-এর মারকায।

৫. তাঁর আরেক বিতর্কিত বক্তব্য হলো, যারা ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল রাখে, তারা সব উলামায়ে সূ (নিকৃষ্ট আলেম)। অথচ তাঁর সফরসঙ্গী স্বয়ং তাঁর ফতোয়ার বিরোধিতা করে ক্যামেরাওয়ালা মোবাইলে প্রতিনিয়ত তাঁর বক্তব্য সারা বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে!!

এ জাতীয় আরো অনেক কথাই তাঁর থেকে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতে সাহারানপুর মাদরাসার উলামায়ে কেরাম, দারুল উলূম দেওবন্দের উলামায়ে কেরাম, মাওলানা আরশাদ মাদানী, আমার শায়খের যিনি জানেশীন হাকীম কালীমুল্লাহ সাহেবসহ অনেকেই এ ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কারো কথায় কর্ণপাত করেননি।

তাঁকে বলা হয়েছে যে আপনি মানুষকে বলুন, আমার থেকে এই কথাগুলো ভুল হয়েছে, আর এটা এটা সহীহ কথা। এটাই তাওবার নিয়ম। দেওবন্দ আর সাহারানপুর তো শুধু এটাই চেয়েছে। আর তো কিছু চায়নি। তারা বলেনি যে আপনি কাজ বন্ধ করুন, আপনি অযোগ্য...এ জাতীয় কিছু তো বলেনি। তার এই ভুলের কারণে অনেক মানুষ গোমরাহ হয়েছে। তাই তাঁকে একটা একটা ভুল স্বীকার করতে হবে এবং সাথে সাথে শুদ্ধ কী, সেটাও বলতে হবে। শুধু এ কথা বললে হবে না যে আমি রুজু করলাম। আমি আমার বক্তব্য প্রত্যাহার করলাম। এগুলো অগ্রহণীয় কথা, এর দ্বারা তাওবা হবে না। এখনো যদি তিনি ভুলগুলো লিস্ট করে দেওবন্দ যেভাবে বলেছে সেভাবে প্রতিটি ভুল স্বীকারকরত এর সঠিক ব্যাখ্যা বিভিন্ন মজলিসে দিয়ে দেন, তবে আমরা তাঁকে সসম্মানে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাব।

বাচ্চার গায়ে যদি নাপাক লেগে যায়, তবে এই অবস্থায় তাকে কেউ কি কোলে নেবে? কখনোই নয়। বরং আগে তাকে পাকসাফ করে তারপর কোলে নেবে। আমরাও তাঁকে সম্মানের সাথে কোলে তুলে নেব, যদি তিনি তাঁর ভুলগুলো থেকে সঠিকভাবে তাওবা করে নেন। তাঁর সাথে উলামায়ে কেরামের ব্যক্তিগত

কোনো আক্রোশ নেই।

নিঃসন্দেহে দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে তাঁর খান্দানের কোরবানী অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই বলে তিনি দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে কখনোই নন। কাজেই কোরআন-সুন্নাহবিরোধী কথা বললে তার বিরোধিতা করা উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব এবং নিজেকে ভুলের উর্ধ্বে মনে না করে শরীয়তবিরোধী বক্তব্য থেকে ফিরে আসাটাও তাঁর কর্তব্য। তাওবা করতে বললে তিনি বলবেন, "করেঙ্গে"। [ভবিষ্যতে তাওবা করে নেব] এমনটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।

তিনি চিঠিতে বলেন, "আমি রুজু করেছি।" এ কথা বললেই তো তাওবা হয়ে যাবে না। বরং একেকটি ভুল উল্লেখ করে তা নিজের ভুল বক্তব্য হিসেবে স্বীকারকরত সঠিক বক্তব্য উম্মতের সামনে পেশ করতে হবে। দেওবন্দ তো এ কথাই বলে যে, তিনি চিঠিতে বলেন যে, আমি রুজু করেছি, কিন্তু পরক্ষণেই মিম্বরে আবার সে কথাই বলেন। এটা কিভাবে রুজু হতে পারে..!

ইসলামে কোনো ব্যক্তি বা স্থান পূজা নেই। কোরআন-হাদীসের কোথাও এ কথা নেই যে মক্কা-মদীনায় যা দেখব তা আমল করবে, যদিও মক্কা-মদীনাকে বরকতময় হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। থানভী (রহ.) চলে গেছেন তো সে থানা ভবনে এখন আর কে যায়? অথচ থানা ভবনকে একসময় আল্লাহওয়ালাদের জায়গা বলা হতো। কাজেই দিল্লির নিজামুদ্দীন মারকায একটি মসজিদ মাত্র। সেটা শরীয়তের কোনো দলিল বা অনুসরণীয় কিছু নয়। আর শরীয়তে তো তাকে বরকতময় স্থান হিসেবেও ঘোষণা করা হয়নি। কাজেই আমরা নিজামুদ্দীনকে পূজা করি না। মাওলানা সাদ সাহেব যতক্ষণ তাওবা না করবেন, ততক্ষণ আমরা তাঁকেও অনুসরণীয় মনে করি না। স্থান কখনোই মাননীয় হতে পারে না। হ্যাঁ, ব্যক্তি মাননীয় হতে পারে–যতক্ষণ সে শতভাগ হকের ওপর থাকে। হকের ওপর থেকে সরে গেলে ব্যক্তি কখনোই অনুসরণীয় থাকতে পারে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), যাঁকে চতুর্থ খলিফার পর পঞ্চম খলিফা হিসেবে ধরা হয়। তাঁকে একবার তাঁর শাগরেদগণ বললেন, "আল্লাহর প্রিয় হাবীবের সাহাবী! আপনি হাদীস বলেন, আমরা তা শুনি এবং আমল করি; কিন্তু সব কথা তো শুনে শেষ করা যায় না। সুতরাং আমরা চাচ্ছি যে আপনার কাজকর্ম, চলাফেরা দেখে দেখে তার অনুসরণ করে তার ওপর আমল করতে।" শাগরেদগণের এত আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়ের অনুমতি দেননি। তিনি এর জবাবে যা বলেন, তার সারমর্ম হলো, 'আমি এখনো জীবিত। আর জীবিত মানুষ ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়। জীবিত মানুষ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যেকোনো সময় ফিতনায় জড়িয়ে পড়তে পারে। তাই তোমরা ওই ব্যক্তির কাজকর্মকে অনুসরণ করতে পারো, যিনি ঈমান নিয়ে চলে গেছেন...।' হাদীসের আরবী পাঠ হলো–

وعن عبد الله بن مسعود قال :لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن، وإن كفر كفر، وإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت ;فإن الحى لا يؤمن عليه الفتنة.

(তাবারানী কাবীর; হা. নং-৮৭৬৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদ; হা .নং-৮৫০)

এটা দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কী বোঝালেন? তিনি বোঝালেন যে ইসলামে কোনো ব্যক্তি পূজা নেই। বালা'আম বিন বাউরা কত বড় বুযুর্গ ছিল, কিন্তু সে বেঈমান হয়ে গিয়েছিল। নবীজির সোহবাতে থাকার পরও অনেকে যাকাত না দেওয়ার কারণে ঈমানহারা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই জীবিত মানুষের ওপর যেকোনো ধরনের ফিতনা আসতে পারে।

মাওলানা সাদ সাহেব এই জুমু'আর দিনেও কাকরাইলে সাহাবীদের নিয়ে একটি ভুল বয়ান করেছেন, যা নিতান্তই বুঝের ভুল। আমরা তো নবীজির কথা সরাসরি শুনিনি, সাহাবায়ে কেরামের ভায়া হয়ে শুনেছি। কাজেই সাহাবায়ে কেরাম হলেন সত্যের মাপকাঠি। তাঁদের সম্মান বজায় রেখে কথা বলতে হবে। সাহাবাবিদ্বেষী যারা তারা নবীবিদ্বেষী। যত বাতিল দল আছে, তারা সাহাবাদের ভুল ধরে থাকে এবং সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। শিয়া, মওদুদী, আহলে হাদীস সবাই সাহাবাবিদ্বেষী। কারণ বাতিলপন্থীদের জানা আছে যে সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জামাতকে বাদ দিয়ে দিতে পারলে ইসলাম তাদের খেলতামাশায় পরিণত হবে।

তাবলীগের কিছু কিছু ব্যক্তি এখন উল্টো পথে যাচেছ। এ বিপথগামিতার বিষয়টিও মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর মালফুজাতে রয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমার এই চলতি-ফিরতি জামাতের সাথে যদি উলামায়ে কেরাম না থাকেন, তবে এ জামাত ভবঘুরে ফিতনার জামাত হবে।" বর্তমান পরিস্থিতিতে তাবলীগ জামাত সেই ভবঘুরে ফিতনার জামাতই হয়ে যাচ্ছিল, আল্লাহ তা'আলা ব্রেক করে দিয়েছেন। আমরা কিছুই করিনি।

তাই দাওয়াত ও তাবলীগের এ মেহনতের দিকে উলামায়ে কেরামের এখন কম খেয়াল দিলে চলবে না; বরং বেশি বেশি তাদের শিরকাত করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে যাবতীয় ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

সানী জামা'আতের শরয়ী বিধান

মুফতী শরীফুল আজম

ইসলামে পুরুষদের জন্য জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। জামা'আতের নামায মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক। এর দ্বারা ইসলামের শক্তি প্রকাশ পায়। ইসলামের শুরুর যুগে মক্কার কাফেরদের ভয়ে মুসলমানরা প্রকাশ্যে নামায আদায় করতে পারত না। হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা জনসমক্ষে জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের শক্তি অর্জন করে। সেই থেকে জামা'আতের বিধান চালু হয়ে আজ অবধি চলছে। এর মাধ্যমে পবিত্র অবস্থায় সম্মিলিতভাবে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য দিনে পাঁচবার একত্রিত হওয়াকে মুসলমান পুরুষদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মুসলমানদের এমন কোনো পাড়া-মহল্লা পাওয়া যাবে না, যেখানে পাঞ্জেগানা নামাযের জামা'আত চালু নেই। এটা জামা'আতের অসামান্য গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে।

তবে এলাকার সকল বাসিন্দাকে দিনে পাঁচবার নিজ এলাকার মসজিদে পাওয়া দুষ্কর। তাই সকলকে একত্রিত করার জন্য সপ্তাহে এক দিন নির্ধারণ করা হয়েছে, অর্থাৎ জুমুআর দিন। জুমুআবারে এলাকাবাসী সকলে মিলে আল্লাহ তা'আলার গুণকীর্তনের সুযোগ পেয়ে থাকে।

আবার ভিন্ন ভিন্ন এলাকার লোককে একত্রিত করার জন্য রাখা হয়েছে ঈদের নামাযের ব্যবস্থা। যেহেতু এটা মুসলমানদের বড় একটি সম্মেলনের রূপ ধারণ করবে, তাই এর ব্যবস্থা করা হয়েছে বাইরে খোলা মাঠে তথা ঈদগাহে।

এরপর আসে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষকে একত্রিত করার পালা। যাতে গোটা বিশ্বের মুসলমানরা এক স্থানে জমা হয়ে মহামহিয়ানের প্রশংসায় মশগুল হতে পারে। নিজেদের ঐক্যের বাঁধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তুলতে পারে। ইসলামের প্রাধান্যকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে পারে। এর জন্য নির্ধারণ করা হয় আরাফার ময়দান। যেখানে সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য একত্রিত হওয়াকে হজের একটি বাধ্যতামূলক অনুসংজ্ঞা করে দেওয়া হয়েছে। [আহকামে ইসলাম আকল কি নযর মে (হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানভী রহ.)]

জামা'আতের উপকারিতা :

জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের বিভিন্ন উপকারিতার প্রতি লক্ষ করে জামা'আতের বিধান রাখা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সওয়াবের ঘোষণা দিয়ে এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সাথে সাথে জামা'আত ত্যাগকারীদের প্রতি কঠোর ধমকি দেওয়া হয়েছে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে জামা'আতের চারটি বৃহৎ ফায়দার কথা উল্লেখ করেছেন।

১. জামা'আতের সাথে নামায আদায় মানুষকে দুনিয়ার ঝামেলামুক্ত হতে সাহায্য করে।

২. সাধারণ মানুষের নামাযের প্রতি অলসতা দূর হয় এবং আলেমদের কাছ থেকে নামায শেখার সুযোগ হয়।

৩. সম্মিলিতভাবে নামাযরত মুসল্লিদের ওপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়।

৪. ইসলামের একটি বিধানের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয়।

(রাহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়া শরহী হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ৩/৫৭১)

জামা'আতের গুরুত্ব :

জামা'আতের এই গুরুত্বের প্রতি লক্ষ করেই মূলত মসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত বা সানী জামা'আতের পথ বন্ধ করা হয়েছে। যদি তা না করা হয় তবে জামা'আতের সময় লোক পাওয়া যাবে না। যার যখন মনে চায় মসজিদে এসে জামা'আত করার সুযোগ পেলে জামা'আতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরবে। তাই সানী জামা'আত নিষিদ্ধ।

নবীজি (সা.) একবার কিছু লোককে জামা'আতে অনুপস্থিত পেলেন। এতে নবীজি (সা.) খুব রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমার মনে চায় কাউকে ইমামতির দায়িত্ব ন্যস্ত করে ওই সমস্ত লোকদের কাছে যাই, যারা জামা'আতে আসেনি। অতঃপর তাদের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিই। (মুসলিম-২৫১)

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نا سا في بعض الصلوات، فقال :لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، فآمر بهم فيحرقوا عليهم، بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (রহ.) লেখেন,

فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة لم يهم باحراق من تخلف عن الاولى لاحتمال ادراكه الثانية اذا ثبت هذا فنقول: ان وجوب الاتيان الى الجماعة الاولى يستلزم كراهية الثانية في المسجد الواحد حتما فانهم لا يجتمعون اذا علموا انهم لا تفوتهم الجماعة الثانية (اعلاء السنن باب كراهة تكرار الجماعة في مسجد المحلة)

অর্থাৎ যদি সানী জামা'আত বৈধ হতো তবে প্রথম জামা'আত পরিত্যাগকারীদের আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ

করতেন না। কেননা তারা দ্বিতীয় জামা'আতে শরীক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই আমরা এ কথা বলতে পারি যে প্রথম জামা'আতে শরীক হওয়া বাধ্যতামূলক করা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে একই মসজিদে সানী জামা'আত মাকরূহ। কেননা সানী জামা'আত পাওয়ার ভরসা থাকলে প্রথম জামা'আতে মুসল্লিরা একত্রিত হবে না।

নবীজি (সা.)-এর আমল :

একদা নবীজি (সা.) আনসারদের এলাকায় একটি সালিস করতে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন মসজিদে নববীতে নামায শেষ হয়ে গেছে। তখন নবীজি (সা.) নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন এবং পরিবারের লোকদের একত্রিত করে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করলেন।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ نَوَاحِى الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلاَةَ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ(الطبرانى ٢٨٤/٣ حديث رقم ٤٦٠١، مجمع الزوائد ١٦٠/١)

নবীজি (সা.)-এর এই আমল উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে রইল। তিনি ইচ্ছা করলে মসজিদে সানী জামা'আত কায়েম করতে পারতেন। যাদের নামায হয়ে গেছে তাদেরকে নফলের নিয়্যাতে পেছনে দাঁড় করিয়ে এই জামা'আত হতে পারত। অথবা পরিবারের লোকজন তো মসজিদসংলগ্ন হুজরাতেই অবস্থান করছিলেন। তাঁদেরকে মসজিদে ডেকে এনে সানী জামা'আত করতে পারতেন। কিন্তু না, তিনি এমনটি করলেন না বরং মসজিদ ছেড়ে ঘরে গিয়ে জামা'আত করলেন। এর দ্বারা উম্মতকে এই সবক দিলেন যে মহল্লার মসজিদে মহল্লাবাসীর জন্য সানী জামা'আতের অনুমতি নেই। সম্ভব হলে ঘরে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জামা'আত করবে অথবা একাকী আদায় করবে।

আল্লামা শামী (রহ.) উক্ত হাদীস উল্লেখ করে বলেন,

لوجاز ذلك لما اختار الصلاة فى بيته على الجماعة فى المسجد ولان فى الاطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى فانهم لا يجتمعون اذا علموا انهم لا تفوتهم (رد المحتار سعيد ٥٥٣/١)

যদি সানী জামা'আত বৈধ হতো তবে মসজিদে জামা'আত না করে তিনি ঘরে জামা'আত করতেন না। তা ছাড়া সানী জামা'আতের ব্যাপক অনুমতি থাকলে জামা'আতে লোকসংখ্যা হ্রাস পাবে। কেননা মুসল্লিরা যখন বুঝতে পারবে যে জামা'আত ছোটার ভয় নেই তখন তারা একত্রিত হতে পারবে না। (রদ্দুল মুহতার-১/৫৫৩)

মসজিদভেদে হুকুম :

মসজিদভেদে সানী জামা'আতের হুকুমের মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। মসজিদ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। মহল্লার মসজিদ, বাজারের মসজিদ, পথের মসজিদ, রেল অথবা বাসস্টেশনের মসজিদ, মার্কেটের মসজিদ অথবা স্কুল-কলেজ বা অফিসের নামাযঘর।

এ সকল স্থানে সানী জামা'আতের বিধান নির্ভর করে একটি মূলনীতির ওপর। মসজিদ চাই ওয়াক্‌ফকৃত শরয়ী মসজিদ হোক বা ওয়াক্‌ফ ছাড়া মসজিদ হোক কিংবা নামাযঘর হোক। ওই মূলনীতিটির দিকে লক্ষ করে সকল স্থানে সানী জামা'আতের বিধান নির্ণয় হয়ে থাকে। আর তা হচ্ছে تقليل الجماعت তথা জামা'আতকে ছোট করে ফেলা। নামাযের বড় জামা'আতকে ছোট করে ফেলা মাকরূহ। সানী জামা'আতের কারণে যেহেতু মূল জামা'আত ছোট হয়ে যায় তাই এটা মাকরূহ। অতএব যে স্থানে সানী জামা'আত দ্বারা মূল জামা'আত প্রভাবিত হবে, সেখানে সানী জামা'আত মাকরূহ বলে বিবেচিত হবে। আর মূল জামা'আত প্রভাবিত না হলে মাকরূহ হবে না।

এ বিষয়ে আল্লামা কাসানী (রহ.) বলেন,

لان التكرار يؤدى الى تقليل الجماعة لان الناس اذا علموا انهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة واذا علموا انها لاتفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة وتقليل الجماعة مكروه (بدائع الصنائع زكريا ٣٨٠/١)

বারবার জামা'আত হলে তা জামা'আতের আকার ছোট হওয়ার কারণ হবে। কেননা জামা'আত ছুটে যাওয়ার ভয় থাকলে মানুষ দ্রুত আসবে, ফলে জামা'আত বড় হবে। অন্যথায় গড়িমসি করে দেরি করতে থাকবে, ফলে জামা'আত ছোট হয়ে যাবে। আর জামা'আত ছোট করে ফেলা মাকরূহ। (বাদায়ে-১/৩৮০)

হানাফী মাযহাবের অন্যতম মৌলিক কিতাব 'মাবসুত'-এর লেখক বলেন,

انا امرنا بتكثير الجماعة وفى تكرار الجماعة فى مسجد واحد تقليلها (المبسوط ١٣٦/١)

জামা'আতকে বড় করার ব্যাপারে আমরা আদিষ্ট আর একই মসজিদে বারবার জামা'আত করা জামা'আতকে ছোট করার নামান্তর। (মুবসুত-১/১৩৬)

মহল্লার মসজিদ :

এক. যে সকল মহল্লা বা গ্রামের মসজিদে ইমাম নির্দিষ্ট আছে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নিয়মিত জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেখানে নির্ধারিত জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর এলাকাবাসীর জন্য পূর্বের মতো করে সানী জামা'আত করা মাকরূহে তাহরিমী। কেননা এর দ্বারা মূল জামা'আতে প্রভাব পড়ে।

عن الحسن قال كان اصحاب رسول الله ﷺ اذا دخلوا المسجد وقد صلى فيه صلوا فرادى۔ (المصنف لابن ابى شيبة حديث رقم ٧١٨٨)

يكره تكرار الجماعة فى مسجد محلة باذان واقامة الخ (شامى ٥٥٢/١)

দুই. তবে যদি মহল্লাবাসীর হঠাৎ কখনো জামা'আত ছুটে যায় এবং কিছু লোক জমা হয়ে মেহরাব থেকে পেছনে বা ডানে-বামে সরে সানী জামা'আত করে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর নিকট জায়েয হবে। ইমাম মুহাম্মদ এবং

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে মাকরূহে তানযীহী হবে। আর এটাই গ্রহণযোগ্য মত। (আহসানুল ফাতাওয়া [যাকারিয়া] ৩/৩২২, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া [কাদীম] ৭/১১৯, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া [কাদীম] ৩/২৬)

তিন. মহল্লার মসজিদে নির্দিষ্ট ইমামের পেছনে নিয়মিত জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর মসজিদের কম্পাউন্ডের ভেতর অবস্থিত কোনো কামরায় বা খোলা স্থানে মহল্লার নিয়মিত মুসল্লিদের জন্য সানী জামা'আত করা বৈধ নয়। কেননা এর দ্বারা মূল জামা'আত প্রভাবিত হয় এবং একদল লোক অলসতা করার সুযোগ পায়। তাই মূল মসজিদে সানী জামা'আতের মতোই এখানে জামা'আত করা মাকরূহ হবে।

واذا علموا انها لا تفوتهم الجماعة فيتأخرون فتقل الجماعة وتقليل الجماعة مكروهة (بدائع الصنائع ١/٣٥١، شامى ١/٢٥٥)

চার. মহল্লা বা গ্রামের মসজিদে ইমাম নির্ধারিত নেই এবং নির্দিষ্ট সময়ে জামা'আত আয়োজনের কোনো ব্যবস্থাও নেই এ ধরনের মসজিদে সানী জামা'আত বৈধ। কেননা এর দ্বারা কোনো জামা'আত প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

او مسجد لا امام له ولا مؤذن (شامى سعيد ١/٥٥٢)

পাঁচ. মহল্লার মসজিদে বাইরের মানুষ আযান-ইকামতের সাথে জামা'আত করে ফেলে অথবা মহল্লার লোকেরা আযান ছাড়া জামা'আত করে ফেলে তবে সেখানে দ্বিতীয়বার মূল জামা'আত আদায় করা বৈধ।

يكره تكرار الجماعة فى مسجد محلة باذان واقامة الا اذا صلى بهما فيه اولا غير اهله او اهله لكن بمخافتة الاذان (شامى سعيد ١/٥٥٢)

ছয়. মহল্লার মসজিদে নির্ধারিত জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর পথিক বা মুসাফিরের জন্য সেখানে সানী জামা'আত করা বৈধ। তদ্রূপ কোনো তাবলীগী জামা'আত কোনো মসজিদে গিয়ে দেখল জামা'আত শেষ হয়ে গেছে তাহলে মসজিদের ভেতরে পেছনে কোথাও সানী জামা'আত করা তাদের জন্য বৈধ হবে। কেননা এরা মসজিদের নিয়মিত মুসল্লি নয়। তাদের এই জামা'আত দ্বারা মূল জামা'আত প্রভাবিত হবে না।

وبخلاف ما اذا صلى فيه غير اهله لانه لايؤدى الى تقليل الجماعة لان اهل المسجد ينتظرون اذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ (بدائع ١/١٥٣)

সাত. মহল্লার মসজিদের নির্ধারিত জামা'আতের পূর্বে যদি মুসাফির দল সফরের তাড়া থাকায় ইকামত দিয়ে ভিন্ন জামা'আত করে নেয় তবে তা বৈধ হবে। এমতাবস্থায় মহল্লাবাসীর আযান-ইকামতের সাথে জামা'আত করতেও কোনো কোনো আপত্তি নেই। কেননা এখানে মুসাফিরদের জামা'আতের প্রভাব মূল জামা'আতে পড়বে না।

فان صلى قوم من الغرباء بالجماعة فلاهل المسجد ان يصلوا بعدهم بجماعة باذان واقامة لان اقامة الجماعة فى هذا المسجد حقهم (منحة الخالق على هامش البحر رشيديه ١/٦٠٢)

আট. মহল্লার নিয়মিত মুসল্লিগণ যদি সফরে বের হওয়ার প্রাক্কালে সফরের তাড়া থাকায় মসজিদের জামা'আতের পূর্বে মসজিদের ভেতরে জামা'আত করে নিতে চায় তবে তা মাকরূহ বলে বিবেচিত হবে। তবে মসজিদের বাইরে কোথাও জামা'আত করে নিলে কোনো অসুবিধা হবে না।

لو صلى بعض اهل المسجد باقامة وجماعة ثم دخل المؤذن والامام وبقية الجماعة بالجماعة المستحب لهم والكراهة للاولى (هندية ١/٥٤)

নয়. মহল্লার নির্ধারিত জামা'আতে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির কারণে যদি শরীক হতে ব্যর্থ হয় তবে এ ধরনের ওজরের সময় মহল্লার মসজিদে সানী জামা'আত করা বৈধ। মেহরাব থেকে সরে জামা'আত করে নিতে পারবে। তবে তা অভ্যাসে পরিণত করা যাবে না। সামান্য বৃষ্টি হলেই কেহ এই সুযোগ কাজে লাগাতে চাইলে তা ঠিক হবে না। এটা শুধু প্রবল ঝড়-বৃষ্টির ওজরের কারণে হতে পারে।

واختلف فى كون الامطار والثلوج والاوحال والبرد الشديد عذرا وعن ابى حنيفة ان اشتد التأذى يعذر، قال الحسن افادت هذه الرواية ان الجمعة والجماعة فى ذلك سواء (شامى زكريا ٢/٢٩٢)

দশ. মহল্লার মসজিদে যদি উপস্থিত মুসল্লিদের যায়গা সংকুলান না হয় এবং আশপাশে অন্য কোনো মসজিদও না থাকে তাহলে যে সকল মুসল্লি যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যায়গা পেল না, তাদের জন্য সানী জামা'আত করা জায়েয হবে। কেননা সানী জামা'আত মাকরূহ হওয়ার মূল কারণ এখানে পাওয়া যায়নি। এই জামা'আতের দ্বারা মূল জামা'আতে কোনো প্রভাব পড়ছে না। এখানে তো প্রথম জামা'আতের সময় হাজির হওয়া সত্ত্বেও যায়গা মেলেনি। এ হিসেবে যদি বলা হয় এটা সানী জামা'আতই নয় বরং প্রথম জামা'আতেরই অংশ, তাহলে সেটা ভুল হবে না।

لان التكرار يؤدى الى تقليل الجماعة ـــ وتقليل الجماعة مكروهة (بدائع الصنائع ١/١٥٣)

বাজারের মসজিদ :

এক. বাজারের মসজিদে যদি ইমাম ও মুসল্লি নির্দিষ্ট থাকে এবং নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত জামা'আত হয়ে থাকে তবে আশপাশের লোকের জন্য সেখানে প্রথম জামা'আতের মতো করে সানী জামা'আত করা মাকরূহ হবে। কেননা এর দ্বারা মূল জামা'আত প্রভাবিত হবে এবং মানুষ জামা'আতে হাজির হতে অলসতা করবে।

انا امرنا بتكثير الجماعة وفى تكرار الجماعة فى مسجد واحد تقليلها لان الناس اذا عرفوا انهم تفوتهم الجماعة يعجلون للحضور فتكثر الجماعة واذا علموا انه لاتفوتهم يؤخرون فيؤدى الى تقليل الجماعة (المبسوط للسرخسى بيروت ١/١٣٥)

দুই. বাজারের মসজিদে ইমাম ও মুসল্লি নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও দূর-দূরান্তের লোক হাট-বাজার করতে এসে মসজিদে নামায আদায় করে থাকে। এ ধরনের লোকদের জন্য বারবার জামা'আত আদায় করতে থাকা জায়েয হবে। কেননা এর দ্বারা মসজিদের মূল জামা'আতে নামাযী কমার সম্ভাবনা নেই।

وبخلاف ماذا صلى فيه غير اهله لانه لايؤدى الى تقليل الجماعة (بدائع الصنائع ١/١٥٣)

তিন. বাজারের মসজিদে যদি ইমাম ও মুসল্লি নির্দিষ্ট না থাকে বরং যে যখন আসে নামায পড়ে থাকে। তাহলে এখানে বারবার জামা'আত করা জায়েয হবে। সানী জামা'আত মাকরূহ হওয়ার কোনো কারণ এখানে পাওয়া যায় না।

مسجد ليس له مؤذن وامام معلوم يصلى فيه الناس فوجا فوجا بجماعة الافضل الا يصلى فيه كل فريق باذان واقامة على حدة (شامى ١/٥٥٣)

চার. বাজারের মসজিদে ইমাম ও নির্ধারিত জামা'আতের ব্যবস্থা আছে কিন্তু হাটের দিন বা বিশেষ বিশেষ সময়ে মুসল্লির সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে উপস্থিত মুসল্লিদের যায়গা সংকুলান হয় না, এমতাবস্থায় প্রথম জামা'আতে যায়গা না পেলে দ্বিতীয় জামা'আত করতে পারবে। একে তো এরা বাইরের মুসল্লি, দ্বিতীয়ত স্থান সংকুলান না হওয়ার মতো ওজর দেখা দিয়েছে। এ ধরনের জামা'আত দ্বারা মূল জামা'আত প্রভাবিত হবে না বিধায় তা বৈধ।

لان التكرار يؤدى الى تقليل الجماعة ـــ وتقليل الجماعة مكروهة (بدائع الصنائع ١/١٥٣)

পথের মসজিদ :

এমন মসজিদ, যার আশপাশে কোনো জনসবতি নেই। মুসাফির পথিকদের জন্য মাঝপথে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ ধরনের মসজিদে সাধারণত ইমাম নির্ধারিত থাকে না। আর যদি থাকেও নির্দিষ্ট মুসল্লি থাকে না। এমন পথের মসজিদে যে যখন যাবে, জামা'আতের সাথে নামায আদায় বৈধ হবে।

واما مسجد شارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق (شامى زكريا ٢/٢٨٩)

وقال القدورى : لابأس به فى مسجد فى قارعة الطريق (البحر الرائق ١/٣٤٦)

بخلاف المساجد التى على قوارع الطريق الانها ليست لها اهل معروفون فاداء الجماعة فيها مرة بعد اخرى لايؤدى الى تقليل الجماعات (بدائع الصنائع سعيد ١/١٥٣)

নামাযঘরে সানী জামা'আত :

ওয়াক্ফকৃত শরয়ী মসজিদ ছাড়া যে সকল স্থানে নামাযের ব্যবস্থা করা হয় যেমন মার্কেটের কোনো ফ্লোরে বা ছাদে, অফিস-আদালতে, কিংবা মাদরাসা বা স্কুল-কলেজের হলে। এ সকল নামাযের স্থানে নির্ধারিত ইমাম ও মুসল্লির মাধ্যমে নিয়মিত জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে তার হুকুম মহল্লার মসজিদের মতো হবে। আশপাশের লোকদের জন্য সেখানে সানী জামাআ'ত করা মাকরূহ হবে। আর নতুন আগন্তুকদের জন্য বৈধ হবে। কেননা প্রথম অবস্থায় تقليل جماعت তথা মূল জামা'আত ছোট হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর দ্বিতীয় অবস্থায় এই ভয় নেই।

لان التكرار يؤدى الى تقليل الجماعة ـــ وتقليل الجماعة مكروهة (بدائع الصنائع ١/١٥٣)

উল্লেখ্য যে সানী জামা'আত মাকরূহ হওয়ার কারণ শরয়ী মসজিদ হওয়া নয় অন্যথায় পথের শরয়ী মসজিদেও সানী জামা'আত মাকরূহ হতো। বরং সানী জামা'আত মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে প্রথম জামা'আত প্রভাবিত হওয়ার ওপর। যে স্থানে সানী জামা'আতের কারণে মূল জামা'আতের মুসল্লি কমে যায় সেখানে সানী জামা'আত মাকরূহ বলে বিবেচিত হয়।

بخلاف المساجد التى على قوارع الطريق لانها ليست لها اهل معروفون فاداء الجماعة فيها مرة بعد اخرى لايؤدى الى تقليل الجماعة (بدائع الصنائع ١/١٥٣)

স্টেশনের মসজিদ :

রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড বা লঞ্চঘাটে যে সকল মসজিদ থাকে তা পথিক, মুসাফির বা যাত্রীদের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এমন মসজিদ সাধারণত মহল্লা বা লোকালয় থেকে ভিন্ন স্থানে হয়ে থাকে। এ ধরনের মসজিদে বারবার জামা'আত করা বৈধ। নির্ধারিত ইমাম ও জামা'আতের ব্যবস্থা করা হলেও সানী জামা'আত বৈধ হবে। তবে নির্ধারিত ইমামের সাথে যে জামা'আত হবে তা আযান ও ইকামতের সাথে হবে আর বাকি জামা'আতগুলো আযান ছাড়া শুধু ইকামতের মাধ্যমে আদায় করা হবে। মুসাফিরগর ওই মসজিদের নির্দিষ্ট জামা'আতের আগে বা পরে নিজেদের মতো করে জামা'আত করতে পারবে। যেমন মহল্লার মসজিদে মুসাফিরগণ মূল জামা'আতের পূর্বে জামা'আত করতে পারে। অতঃপর মহল্লার লোকেরা নির্ধারিত সময়ে মূল জামা'আত করে নেয়।

وانما اختصت الكراهة بمسجد المحلة لانعدام علتها فى مسجد الشارع والسوق ونحوها فان الناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق وهذا هو مذهب ابى حنيفة (اعلاء السنن ، كتاب الوضو ، باب كراهة تكرار الجماعة فى مسجد المحلة بيروت ٤/٢٦١)

وبهذا فارق المسجد الذى على قارعة الطريق لانه ليس له قوم معلومون فكل من حضر يصلى فيه فاعادة الجماعة فيه مرة بعد مرة لاتؤدى الى تقليل الجماعات (المبسوط للسرخسى بيروت ١/١٣٦)

يكره تكرار الجماعة فى مسجد محلة باذان واقامة الا اذا صلى بهما فيه اولا غير اهله او اهله لكن بمخافتة الاذان ولو كرر اهله بدونهما او كان مسجد طريق جاز اجماعا (شامى ١/٥٥٢)

জুমু'আর নামায :

পাঞ্জেগানা নামাযের সাথে জুমু'আর

নামাযের কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। জুমু'আ ওয়াজিব হওয়ার বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে। আবার জুমু'আ আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতেক শর্ত রয়েছে। এ সকল শর্ত পাওয়া গেলে যোহরের নামায পড়া যায়েয হবে না, জুমু'আই পড়তে হবে।

এক. যাদের ওপর জুমু'আ ওয়াজিব এমন লোকেরা মসজিদে এসে যায়গা পেল না। বাহিরে দাঁড়ানোরও সুযোগ নেই। অন্য মসজিদে গিয়ে জুমু'আ আদায়ের মতো সময়ও হাতে নেই। এমতাবস্থায় প্রথম জামা'আত শেষ হওয়ার পর সানী জামা'আত করার মতো লোক থাকলে জুমু'আর সানী জামা'আত বৈধ হবে। জুমু'আর খোতবা পাঠ করে ইমামতি করার মতো একজন এবং তার সাথে কমপক্ষে তিনজন মুক্তাদি হলে জুমু'আর জামা'আত শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা এখানে সানী জামা'আত মাকরূহ হওয়ার মূল কারণ বিদ্যমান নেই। এখানে মূল জামা'আতের মুসল্লি হ্রাস পাচ্ছে না বরং মুসল্লি বেশি হওয়ার কারণে স্থান সংকুলান না হওয়ায় সানী জামা'আত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যেভাবে মুসাফিরদের সানী জামা'আত মূল জামা'আতে প্রভাব ফেলে না এখানেও তাই। মুসাফিরদের জন্য যেভাবে ইকামত দিয়ে জামা'আত করার সুযোগ আছে এখানেও ইকামত দিয়ে সানী জামা'আত পড়া যাবে।

انا امرنا بتكثير الجماعة وفى تكرار الجماعة فى مسجد واحد تقليلها (المبسوط للسرخسى بيروت ٣٧٩/١)

فمن توفرت فيه هذه الشروط حرم عليه صلوٰة الظهر قبل فوات الجمعة لما فى ذلك من مخالفة الامر باسقاط صلوٰة الظهر واداء الجمعة فى مكانها (الموسوعة الفقهية ٢٠١/٢٧)

তবে একই মসজিদে দ্বিতীয়বার জুমু'আ পড়তে গেলে কিছুটা সংশয় দেখা দেয়। কেননা ফিকাহর বিভিন্ন কিতাবে জুমু'আর নামায শেষে মসজিদ বন্ধ করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

والظاهر انه يغلق ايضا بعد اقامة الجمعة لئلا يجتمع فيه بعدها۔

আল্লামা শামী (রহ.) উক্ত এবারতটি বর্ণনা করার পর এ ব্যাপারে স্বীয় মন্তব্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন যে,

ثم كل هذا مبالغة فى المنع عن صلاة غير الجمعة واظهارا لتاكدها (رد المحتار ١٥٧/٢)

অর্থাৎ জুমু'আর দিন পাঞ্জেগানা মসজিদ বন্ধ রাখা বা জামে মসজিদে জুমু'আ আদায়ের পর বন্ধ করে দেওয়ার হুকুমটি শুধুমাত্র জুমু'আর প্রতি জোর দেওয়া ও গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। যাতে করে লোকেরা জুমু'আর নামাযে শরীক হতে অলসতা না করে। এর অর্থ এই নয় যে, উপস্থিত মুসল্লিদের মসজিদে যায়গা সংকুলান না হলে বা বৃষ্টির কারণে বাইরে দাঁড়াতে না পারলে তাদেরকে দ্বিতীয় জামা'আত করতে দেওয়া যাবে না। বিধায় এ ধরনের পরিস্থিতিতে জুমু'আর সানী জামা'আত করা যাবে।

দুই. জুমু'আর নামায শেষ হওয়ার পর এমন কিছু লোক মসজিদে হাজির হলো, যাদের মাঝে জুমু'আ ওয়াজিব হওয়ার সকল শর্তাবলি বিদ্যমান। খোতবা পাঠ করে ইমামতি করার মতো লোকও তাদের মাঝে রয়েছে। আশপাশে অন্য কোনো মসজিদে গিয়ে নামায পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। এমতাবস্থায় তারা কি করবে? যোহর আদায় করে নেবে, নাকি জুমু'আর সানী জামা'আত করবে?

এসংক্রান্ত একটি মাসআলা বিভিন্ন ফিকাহ ফতওয়ার কিতাবে পাওয়া যায়।

قال فى الظهرية: جماعة فاتتهم الجمعة فى المصر فانهم يصلون الظهر بغير اذان ولا اقامة ولا جماعة۔

অর্থাৎ শহরে থাকা লোকের জুমু'আ ছুটে গেলে তারা যোহরের নামায আযান-ইকামত এবং জামা'আত ছাড়া আদায় করে নেবে। তবে এই মাসআলাটি দলিলহীন বলে মন্তব্য করেছেন আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (রহ.)। তাঁর মতে, এ ধরনের লোকের মাঝে জুমু'আর সকল শর্ত উপস্থিত থাকায় জুমু'আ আদায় আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি ফতওয়া হুবহু তুলে ধরা হলো।

سوال: یہاں جمعہ کی نماز ایک ہی جامع مسجد میں ہوتی ہے، گاہ گاہ بعض بعض نمازیوں کے پہونچنے سے قبل ہی نماز جمعہ ختم ہوجاتی ہے اب وہ لوگ دوسری مسجد میں جاکر اذان واقامت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرسکتے ہیں یا نہیں، یا جمعہ کی نماز ادا کریں یا فرادیٰ فرادیٰ ظہر کی نماز پڑھیں، جو کچھ شریعت کا حکم ہو اس سے اطلاع دیجئے۔

جواب: فى الدر المختار (وكذا اهل مصر فاتتهم الجمعة) فانهم يصلون الظهر بغير اذان ولا اقامة ولا جماعة وقال الشامى الظاهر ان الكراهة هنا تنزيهة لعدم التقليل والمعارضة المذكورين ويؤيده ما فى القهستانى عن المضرات يصلون وحدانا استحبابا ٨٥٦/١ وفى بحر الرائق ١٥٤/٢ قال فى الظهيرية جماعة فاتتهم الجمعة فى المصر فانهم يصلون الظهر بغير اذان ولا اقامة ولا جماعة ، وهكذا فى الخلاصة ٢١١/١) (امداد الاحكام ٧٨٣/١)

قواعد سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مصر میں کم از کم چار شخص جمعہ سے رہ جاویں تو وہ جمعہ کی نماز دوسری مسجد میں پڑھیں اور ان سب میں وجوب جمعہ کی شرطیں پائی جاتی ہوں تو جمعہ واجب ہو، اور اگر فقط صحت کی شرطیں ہوں تو واجب نہ کہا جاوے، لیکن پڑھیں تو صحیح ہو، مگر جزئیہ کوئی نہیں ملا، بلکہ روایات مذکورہ بالا سے بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر حال میں تنہا تنہا ظہر پڑھیں، لیکن خلاف قواعد ہونے کی وجہ سے ان روایتوں میں تاویل کی جاوے گی، اور میرے نزدیک ان روایتوں میں کئی تاویل ہوسکتی ہیں۔

اول: تو یہ کہ ان روایتوں کو مبنی کہا جاوے تعدد جمعہ کے عدم جواز پر اور جب مفتی بہ جواز تعدد ہے تو یہ روایت بھی مفتی بہ نہ رہے گی، وہذا ما قالہ سیدی وھو وجہ وجیہ، دوسرے یہ کہ جماعت کے لفظ کو محمول کیا جاوے چار سے کم پر، یعنی دو یا تین آدمی، رہ جاویں تو وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے بوجہ فوت ہونے شرط جماعت کے، بلکہ تنہا تنہا پڑھیں، کیونکہ جمعہ کے دن مصر میں ظہر کی جماعت مکروہ ہے اور یہ تاویل گو خلاف ظاہر ہے لیکن زیادہ بعید بھی نہیں، تطبیق روایات میں اس سے زیادہ بعید کا تحمل کرلیا جاتا ہے، اول یہ دو تاویلیں لکھنے کا ارادہ تھا، کیونکہ اور کوئی تاویل ذہن میں نہ تھی، لیکن عین لکھنے کے

কেহ থাকলে দ্বিতীয়বার জুমু'আর জামা'আত কায়েম করতে হবে। মসজিদের বাইরে কোনো স্থান পেলে সেখানে করাই উত্তম বলে বিবেচিত হবে। অন্যথায় মসজিদের এক পাশে জামা'আত করতে পারবে।

পাঞ্জেগানা ও জুমু'আর জামা'আতে পার্থক্য :

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামা'আত আর জুমু'আর জামা'আতের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। পাঞ্জেগানা নামাযের জামা'আত ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। নামায সহীহ হওয়া না হওয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে জুমু'আর জামা'আত নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম শর্ত। তা ছাড়া পাঞ্জেগানা নামাযের জামা'আত একজন মুক্তাদী হলেও সহীহ হয়। পক্ষান্তরে জুমু'আর জামা'আত শুদ্ধ হতে ইমাম ছাড়া কমপক্ষে তিনজন মুক্তাদী প্রয়োজন। তাই জুমু'আ সহীহ হওয়ার অন্য শর্তাবলির সাথে ইমামতির উপযুক্ত এক জন ব্যক্তি ও তার সাথে তিনজন মুক্তাদী থাকাবস্থায় জুমু'আ আদায় আবশ্যকীয়। আর যেহেতু ফতওয়া একই শহরে একাধিক জুমু'আর জামা'আত বৈধ হওয়ার পক্ষে তাই প্রয়োজনের সময় একই মসজিদে ভিন্ন ইমামের পেছনে একাধিক জামা'আতের অনুমতিতে শরয়ী কোনো বাধা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

ان الجمع المطلق شرط انعقاد الجمعة فى حق كل واحد منهم--- وهذا بخلاف سائر الصلوة لان الجماعة هناك ليست بشرط للجواز--- (بدائع ٢٦٨/١)

وروى محمد عن ابى حنيفةؒ انه يجوز الجمع فى موضعين او ثلاثة او اكثر من ذلك (بدائع ٢٦١/١)

وتؤدى فى مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب وعليه الفتوى (الدر المختار ١٤٤/٢)

مذکور کے مطابق پایا۔(امدادالاحکام۱/۷۸۳)

অনুরূপ ফতওয়া প্রদান করেছেন মাওলানা আব্দুল হাই লাখনভী (রহ.)

سوال: جمعہ کی جماعت ہوجانے کے بعد دس پندرہ آدمی آگئے یہ لوگ اسی مسجد میں جمعہ مع خطبہ جماعت سے پڑھے یا بجماعت ظہر ادا کریں؟

جواب: چونکہ تعدد جماعت جمعہ بمذہب صحیح جائز ہے اور بروز جمعہ جس شخص پر جمعہ فرض ہے اس کو ظہر پڑھنا درست نہیں ہے اسی لیے ان لوگوں کو چاہئے کہ جمعہ بجماعت مع خطبہ ادا کریں اگر اسی مسجد میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور اولی یہ ہے کہ دوسری مسجد میں ہو۔ (مجموعۃ الفتاوی۱/۲۹۲)

প্রসিদ্ধ ফতওয়া গ্রন্থ খাইরুল ফতওয়ায় এসংক্রান্ত একটি প্রশ্ন উত্তর এভাবে উল্লেখ হয়েছে,

سوال: پندرہ بیس آدمی ایک مسجد میں جمعہ کے روز اس وقت پہنچے جبکہ جمعہ ہوچکا تھا کیا یہ لوگ اس مسجد میں جمعہ بمع خطبہ جماعت سے پڑھیں یا باجماعت ظہر ادا کریں؟

جواب: چونکہ تعدد جمعہ بمذہب صحیح جائز ہے اور بروز جمعہ جس شخص پر جمعہ فرض ہے اس کو ظہر پڑھنا درست نہیں اس لیے ان لوگوں کو چاہئے کہ جمعہ باجماعت مع خطبہ ادا کریں اگر اسی مسجد میں ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اولی یہ ہے کہ دوسری مسجد میں ہو۔ (خیر الفتاوی۳/۷۵)

মোটকথা হলো, জুমু'আর দিন শহরবাসীর জন্য একাকী যোহর নামায পড়ার হুকুমটি শুধুমাত্র ওই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন জুমু'আর নামায পড়তে কোনো বাধা থাকে।

وكره جماعة الظهر لاهل المصر اذا لم يجمعوا لمانع (الهندية ١٤٩/١)

শহরে অবস্থানকারীদের জুমু'আ শুদ্ধ হওয়ার পথে বাধা হতে পারে যে সকল বিষয়, তার অন্যতম হচ্ছে মুসল্লিদের সংখ্যা তিনের কম হওয়া।

والذى يفسد ها على الخصوص اشياء--- ومنها فوت الجماعة الجمعة قبل ان يقيد الامام الركعة بالسجدة بان نفر الناس عنه (بدائع الصنائع ٢٦٩/١)

অতএব জুমু'আর নামায শেষে তিনের অধিক মুসল্লি জমা হলে এবং তাদের সাথে নামাযের ইমামতি করার মতো

وقت ایک تیسری تاویل سمجھ میں آئی احقر کے نزدیک وہ تنہا کافی وافی ہے، اس لئے اسی پر اکتفاء کا ارادہ ہوا تھا، لیکن تتمیم فائدے کے واسطے یہ دونوں بھی درج کردیں، ممکن ہے کسی اہل علم کے نزدیک ان میں سے کسی کو ترجیح ہو،

وہ یہ ہے کہ یہ روایت محمول ہے اس جگہ پر جہاں حکومت اسلامیہ کی طرف سے قاضی وغیرہ مقرر ہوا گر وہاں جمعہ فوت ہوجاوے تو بدون اذن حاکم دوسرا جمعہ نہیں ہوسکتا، باقی ہمارے ملک میں چونکہ تقرر امام کا مدار تراضی مسلمین پر ہے، اس لیے یہ باقی ماندہ لوگ کسی کو امام بنا سکتے ہیں، اور جمعہ پڑھ سکتے ہیں،

كما قال صاحب الخلاصة (ص٢٠٨) ولو اجتمعت العامة على تقديم رجل لم يامره القاضى لم يجز ولم يكن جمعة وان لم يكن ثمه قاضى ولا خليفة الميت فاجتمعت العامة على تقديم رجل للضرورة وفى الدر المختار (نصب العامة) الخطيب (غير معتبر مع وجود من ذكر) اما مع عدمهم فيجوز للضرورة وفيه ايضا وفى النعجة فى تعداد الجمعة لابن جرباش انما يشترط الاذن لاقامتها عند بناء المسجد ثم لا يشترط بعد ذلك۔

غرضیکہ اہل مصر کو تنہا ظہر کا حکم جب ہے کہ جمعہ سے کوئی مانع ہو، ويؤيد هذا ما فى العالمكيرية ونصه جماعة الظهر لاهل المصر اذا لم يجمعوا لمانع (۱/۹۵) اب اس بحر وغیرہ کی روایت متقدمہ کی وجہ سے تو کوئی خلجان نہیں، والحمد للہ علی ذلک۔

الا ان وجوب الجمعة فى هذه الصورة فى ديارنا يقتضى وجوب طلب الاذان فى دار الاسلام وهو غير منصوص فى كتب الفقه ايضا ويمكن الفرق بالتعذر فى طلب الاذن من السلطان وغيره دون نصب امام الجمعة فليتامل۔

لیکن حالت مسئولہ کے متعلق جزئیہ نہ ملنے کے باعث بہتر ہے کہ دوسری جگہ بھی تحقیق کرلیا جاوے اور اس جواب کو بھی وہاں بھیجدیں تا کہ کسی قدر سہولت کا باعث ہوسکتے، یہ دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنا تو جب کہ چار آدمی جمعہ سے رہ جاویں، اور اگر چار سے کم یعنی دو تین آدمی رہ جاویں تو وہ ظہر پڑھیں اور الگ الگ پڑھیں جماعت نہ کریں، اس کے بعد مجموعۃ الفتاوی میں مولانا عبد الحی صاحب کا فتوی بھی اس تحریر

রাসূল (সা.)-এর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা-২

আল্লামা ড. শায়খ নূরুদ্দীন (সাবেক প্রভাষক : জামিয়াতু দামাস্ক)
ভাষান্তর : মুফতী আতীকুল্লাহ

(ডিসেম্বর ২০১৭-এর পর)

মুহব্বত আছে তা কিভাবে বুঝবেন এবং কিভাবে প্রমাণিত হবে :

জেনে রাখা ভালো, ইশক-মুহব্বত ও প্রেম-ভালোবাসা দাবি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার নাম নয় বরং মুহব্বত হলো আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিধিবিধান সাদরে গ্রহণ করা ও নিষিদ্ধ বস্তু থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার নাম। এ হিসেবে মুহব্বত কখনো ফরয আবার কখনো সুন্নাত হয়।

যে মুহব্বত ফরয : ফরয মুহব্বত সেই মুহব্বত, যা নফসকে ফরয আমলসমূহ পালন করার প্রতি তাড়িত করে এবং গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য অনুপ্রাণিত করে ও বাধ্য করে। যে মুহব্বত আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক লিখিত ভাগ্যের ওপর সন্তুষ্ট হতে পূর্ণ প্রস্তুত করে, যে মুহব্বত 'রেযা বিল কাযা'র সবক প্রদান করে, সে মুহব্বতই ফরয মুহব্বত। যে ব্যক্তি কোনো গোনাহে লিপ্ত হলো কিংবা ফরয কাজ ছেড়ে দিল, কিংবা হারামে লিপ্ত হলো সে ব্যক্তির মুহব্বতে দেখা দেবে ঘাটতি; রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সে ব্যক্তির প্রেম-ভালোবাসা হবে অপূর্ণাঙ্গ ও কর্তিত। কারণ সে তো ইশকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর মনোপ্রবৃত্তি ও খাহেশাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। আর এ জিনিসটির উৎপত্তিই হয়ে থাকে (নাউযু বিল্লাহ) গাফলত ও অলসতা থেকে।

যে মুহব্বত সুন্নাত : যে মুহব্বত নফল 'আমলের প্রতি গুরুত্বারোপে অনুপ্রেরণা জোগায়, সাথে সাথে সন্দেহযুক্ত ও সংশয়মূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে সহযোগী হয়, সে মুহব্বতই হলো সুন্নাত। এ আলোচনার সারমর্ম হলো, যে মুমিন বান্দা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম)-কে মুহব্বত করে, তার নিকট শরীয়তের যেসব আদেশ-নিষেধ পৌঁছে, তা একমাত্র মেশকাতে নবুওয়াত থেকেই পৌঁছে এবং সে শুধু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলে। সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম)-এর আনীত ধর্মের প্রতি সর্বোচ্চ সন্তুষ্ট থাকে। সে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আখলাককে নিজের আখলাক, তাঁর আদর্শকে নিজের আদর্শ বানিয়ে নেয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মুহব্বত করে যারা; তাঁকে ভালোবাসে যারা, তারা তাঁর যেকোনো সিদ্ধান্ত ও ফয়সালার সামনে নির্দ্বিধায় মাথানত করে দেয় এবং নিজেদের সর্বসত্তা ও সর্বশক্তি তাঁর নিঃশর্ত-নিরঙ্কুশ আনুগত্যে সোপর্দ করে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এসব কাজে যারা নিজেদের নফসের সাথে মুজাহাদা করেছে, ঈমানের সত্যিকারের স্বাদ তারাই পেয়েছে।

ইমাম বোখারী (রহ.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَىْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রিয় বন্ধুর সাথে শত্রুতা রাখে তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমি যা তার ওপর ফরয করেছি সে ফরয ইবাদতের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোনো ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করবে না। আমার মুমিন বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নিই যে, আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দিই। আমি যেকোনো কাজ করতে চাইলে এটাতে দ্বিধা সংকোচ করি না, যতটা দ্বিধা সংকোচ মুমিন বান্দার প্রাণ হরণে করি। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার কষ্ট অপছন্দ করি। (বোখারী শরীফ, তাওয়াযু অধ্যায়, হা. ৬৫০২)

উপরিউক্ত হাদীস শরীফে মুহব্বতে ইলাহীকে দুই জিনিসে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, যথা–এক. সেই ইশক ও মুহব্বত, যা ফরয আমলসমূহের প্রতি গুরুত্ব ও ইহতেমামের মাধ্যমে অর্জিত হয়। দ্বিতীয়ত সেই আল্লাহপ্রীতি ও মুহব্বতে ইলাহী, যা অর্জিত হয় বেশি বেশি নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ তা'আলাকে মুহব্বত করে তারা বেশি বেশি নফল ইবাদতে মশগুল থাকে, এমনকি আল্লাহ তা'আলার ওলী ও প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়। বান্দা যখন ইশতেগালে

নাওয়াফেল তথা নফল ইবাদতসমূহের মগ্নতা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার মাহবুব বনে যায় তখন তাঁর বরকতে তারা অন্য এমন এক মুহব্বত ও মাহবুবিয়ত অর্জনে ধন্য হয়, যা পূর্বের মুহববত ও মাহবুবিয়ত থেকেও উত্তম। এ তৃতীয় মুহব্বত ও মাহবুবিয়ত পূর্বের অত্যধিক নফল ইবাদত পালন দ্বারা অর্জিত মহাব্বত থেকে বহুগুণে উত্তম, আর এ মুহববত ও প্রেম-ভালোবাসা মানবহৃদয়কে আল্লাহ তা'আলার কাঙ্ক্ষিত মুহব্বতে এত বেশি আত্মনিমগ্ন ও নিমজ্জিত করে দেয়, যা দ্বারা 'জাতে ইলাহী' ও 'যিকরে ইলাহী' এবং ইবাদত ছাড়া সব ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা-জল্পনা থেকে মানবহৃদয় পূর্ণ বিমুখ ও পূতঃপবিত্র হয়ে যায়। জাগতিক আকর্ষণ ও মনোপ্রবৃত্তির স্বভাবজাত টানের ওপর তার রুহু আধিপত্য বিস্তার করে, এমতাবস্থায় তার নিকট প্রেমিকের আলোচনা, মাহবুবের যিকির ও মাশুকের ইশক ছাড়া অন্য কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। তার হৃদঘোড়ার লাগাম যিকরে ইলাহী ও ইশকে ইলাহীর কবজায় চলে আসে। সাথে সাথে তার রুহু ও আত্মা জাগতিক চাহিদা ও মনোপ্রবৃত্তির ওপর রাজত্ব করে এবং যিকির তার আত্মার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, অর্থাৎ যিকরে ইলাহী ও ইবাদতে রাব্বানী তার হৃদয়ের আওয়াজ ও রুহের খোরাকে পরিণত হয়। ফেরেশতাগণের ন্যায় তার 'আমাল ও আযকার, স্বীয় নিঃশ্বাসের সাথে চলতে থাকে। মোদ্দাকথা, আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুহব্বত ও ইশক ছাড়া মানব হৃদয়ের জন্য উন্নত ও সুসমৃদ্ধ জীবন এবং সফল ও কামিয়াব যিন্দেগী অর্জন করা অসম্ভব। মুহিবিবন ও প্রেমিকদের জীবনই সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক জীবন। প্রিয় হাবীবের 'দর্শনে' যাদের চক্ষু শীতল হয়। মাহবুবের 'নরম স্পর্শে' যাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভে ধন্য হয়। মাশুকের সঙ্গ লাভে যাদের দিলে-মনে সর্বাঙ্গে অনাবিল শান্তির স্নিগ্ধ সমীরণ বয়ে যায়।

মুহব্বতের আলামত ও নিশানাসমূহ :

মুহব্বতে ক্রিয়াশীল উপাদানসমূহ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম)-এর প্রতি মুসলমানদের মুহব্বত এমন এক অমূল্য রত্ন, যা মানব হৃদয়ে নূরের ঝলক সৃষ্টি করে। তা থেকে এমন দীপ্তিময় আলোকরশ্মি বের হওয়া জরুরি, যা প্রবল মুহববতের পরিচায়ক হবে। এ আলোকরশ্মি যেমন মুহব্বত ও প্রেম-ভালোবাসার প্রতীক হয়, তেমনি তার মধ্যে থাকতে হবে এমন ক্রিয়াশীল উপাদান, যা দিন দিন মুহব্বতকে করবে সুসমৃদ্ধ ও বর্ধনশীল, এমনকি সে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাহবুবিয়ত অর্জনে ধন্য হবে। বিষয়টি শুধু এতটুকুতেই শেষ নয় যে, আপনি আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মুহববত করবেন; বরং মূল কামিয়াবী ও সফলতা এবং প্রকৃত অর্জন ও সার্থকতা হলো, আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকেও মুহব্বত করবেন। (হে রাব্বে করীম! আপনি আমাদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদেরকে আপনি ভালোবেসেছেন।)

এ পর্যায়ে আমি এমন কিছু আলামত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, যা ইশক-মুহব্বত সৃষ্টিতে ও তার বৃদ্ধিতে এবং প্রেম-ভালোবাসায় সমৃদ্ধি অর্জনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

১. ইত্তেবায়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

অনুসরণ-অনুকরণ ও আনুগত্য, মুহব্বতের সবচেয়ে বড় আলামত এবং প্রেম-ভালোবাসায় বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জনে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। ইত্তেবা ও ইতা'আত মুহববতের পরিচায়ক হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা যে মুহব্বত করে, সে মাহবুবের অনুকরণ ও অনুসরণে অবিচল থাকে; নতুবা মুহব্বতের দাবিতে সে মিথ্যুক প্রমাণিত হবে। ইত্তেবা ও অনুসরণ-অনুকরণ হলো মুহববতে অত্যধিক 'মুআছছির' ও কার্যকর। কেননা ঈমানদারদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা-দীক্ষার জামাল ও সৌন্দর্য এবং তার কামাল ও পূর্ণাঙ্গতার পূর্ণ অনুভূতি আমলিভাবে জেগে ওঠে, আর তাজরেবা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বোঝা যায়, তাদের মধ্যে এমন এক যাওক ও শাওক পয়দা হয় এবং এমন এক রুচি-অভিরুচি তার মধ্যে জাগ্রত হয়, যা দ্বারা তার মুহব্বত ও ভালোবাসা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোরবাত ও নৈকট্য এবং মাহবুবিয়ত অর্জিত হয়।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি মুহববতের দাবিকে পরখ ও পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইত্তেবায়ে রাসূলকে মে'য়ার ও মাপকাঠি বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"তুমি বলো, যদি তোমরা আল্লাহর সঙ্গে মুহব্বত রাখো তবে তোমরা আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গোনাহ মাফ কের দেবেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আল-ইমরান : ৩১)

২. কোরআন কারীমের মুহব্বত :

কোরআন করীম আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালতের প্রমাণ ও দলিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র কোরআন দ্বারা মানব জাতিকে হকের পথ দেখিয়েছেন এবং কোরআনে বর্ণিত আখলাক ও আমালকে পূর্ণাঙ্গরূপে নিজ জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে বাস্তবায়ন করেছেন। এমনকি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাখলুকাতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কোরআন কারীমে ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم ٤)

"অবশ্যই তুমি সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" (আল-কলম : ৪)

আপনি কোরআন শরীফের প্রতি আপনার হৃদয়ের টান, কলবের আকর্ষণ ও দিলের মুহব্বত পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কালামে পাকের শ্রবণে আপনার হৃদয়ে যে সুখানুভূতি হয়, তা পরীক্ষা করে দেখুন; কোরআন শোনার লাজ্জাত ও স্বাধানুভূতি গান-বাজনার চেয়ে বেশি নাকি কম? যদি বেশি হয় তবেই একমাত্র মনে করতে পারেন নিজেকে একজন সত্যিকারের মুহিব্বে কোরআন ও কালামুল্লাহর প্রেমিক। কেননা এটাই সূর্যসত্য যে, যে যাকে মুহব্বত করে, তার কাছে সে ব্যক্তির কথা-বার্তা, আলাপ-আলোচনা, ওঠাবসা, চলাফেরা এককথায় তার সব কিছুই প্রিয় এবং সে হয় তার কাছে সর্বাঙ্গসুন্দর। আর এরূপ মুহব্বত কোরআন করীমের সাথে হবে না কেন? অথচ এ কোরআন করীম শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে সকল আসমানী কিতাব থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। যার আলফাজে রয়েছে সামগ্রিকতা ও গভীরতা এবং তাজল্লিয়াতে হক ও ঐশ্বরিক ঔজ্জ্বল্য। যার বয়ানের জামাল ও বর্ণনার সৌন্দর্য এবং নযমের কামাল ও রচনার পূর্ণাঙ্গতা মানব-দানব সকলকে করে দিয়েছে অক্ষম তার মতো কালাম নিয়ে আসতে। আল্লাহ তা'আলা কোরআন শরীফকে 'রূহ' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا (الشورى ٥٢)

"এভাবে আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ।" (আশ-শূরা : ৫২)

রুহু যেমন শরীরের জন্য জীবনীশক্তি, তেমনি কোরআন করীম সকল আরওয়াহের রুহু ও আত্মার আত্মশক্তির জন্য প্রাণ ও জীবনীশক্তি। সুতরাং একজন আশেক শুধু স্বীয় মাশুকের কালাম দ্বারা কিভাবে পূর্ণ আত্মতৃপ্ত হবে, যখন তার উদ্দেশ্য হয় স্বয়ং মাহবুব ও মাশুক। হযরত উসমান (রা.) বলেন, "আমাদের কলব ও হৃদয় যদি পূতঃপবিত্র হতো তবে আমরা শুধু আল্লাহ তা'আলার কালাম দ্বারা কখনো তৃপ্ত হতাম না।

৩. সুন্নাতে রাসূলের মুহব্বত ও হাদীস অধ্যয়ন :

মাহবুবের আনুগত্য, অনুকরণ ও অনুসরণই হলো মুহব্বতের অবধারিত ফলাফল এবং ভালোবাসার স্বভাবপ্রকাশ। সুতরাং ইশকে নবী ও হুব্বে রাসূলের দাবি ও স্বভাব চাহিদা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত ও তরীকার অনুকরণ করা এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। যিনি সুন্নাতে নববী বিষয়ে অজ্ঞ সে যেন অবশ্যই জ্ঞাত ব্যক্তি থেকে জেনে নেয়। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কালাম ও হাদীস; যা এমন মাহবুবের কালাম যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং তার বাণী ইনসান জাতির মুখনিঃসৃত বাণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী, যা শব্দের দিক দিয়ে সুমধুর ও সুমিষ্ট এবং অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ ও সুগভীর। যদি আপনি সে পর্যায়ে পৌঁছতে না পারেন তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কালাম ও হাদীস গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকেন এবং এমন মজলিসে যান, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কালামের দরস দেওয়া হয়। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন হাদীস শরীফের সেসব মাসনাদে দরসের সাথে আপনার সম্পর্ক ও সাংশ্লিষ্টতা কেমন ও কতটুকু?

৪. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সীরাত ও শামায়েলের প্রতি মুহব্বত :

এ মুহব্বত ও ভালোবাসার স্বভাব চাহিদা হলো, প্রেমিক ও আশেক নিজ মাশুককে ভালোভাবে চিনে নেবে। একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সীরাত ও শামায়েল দ্বারাই তাঁর জাতের (সত্তার) পরিচয় পাওয়া সম্ভব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শামায়েল বিষয়ে ইলম যত বাড়বে, মুহব্বতও তত বাড়বে। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কামালাতের ইলম হাসিল হলে আপনার মারেফাত বৃদ্ধি পাবে, অতঃপর তাঁর প্রতি আপনার মুহব্বতও কামেল হতে থাকবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, একজন ঈমানদার প্রেমিক ও আশেকের জন্য অত্যধিক জরুরি বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী ও সীরাত, শৈশব-কৈশোরের অবস্থা ও প্রাথমিক অবস্থা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর ওহী নাযিল হওয়ার ধরন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাগুণ, আখলাক, স্বভাব-চরিত্র, ওঠাবসা, রুচি-অভিরুচি, জাগ্রত ও ঘুমন্ত, ইবাদত-বন্দেগী করার ধরন, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদাচরণ এবং সাহাবায়ে কেরামের সাথে সদ্ব্যবহার অনুরূপ অন্য গুণাবলিকে জেনে নেওয়া এবং তার ইলম অর্জন করা একান্ত জরুরি। এমন হয়ে যাওয়া উচিত যে সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে সাহাবাদের একজন।

৫. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্মরণ বেশি বেশি করা এবং যখনই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র নাম আসবে তখন শ্রদ্ধা করা : বুযুর্গদের কেউ কেউ বলেছেন, "মুহববত হলো সর্বদা মাহবুবের ইয়াদ ও স্মরণ করা এবং সকল বুদ্ধিজীবী ও বিদ্বান ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যে যাকে মুহব্বত করে এবং ভালোবাসে সে তাকেই বারবার স্মরণ করে এবং তার আলোচনাও বারবার করে।

সায়্যিদুনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আলোচনার সাথে তাঁর তা'যীমের মধ্যে এটাও শামিল আছে যে, তাঁর নামের পূর্বে 'সায়্যিদুনা' ব্যবহার করা। সৈয়দুনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম উচ্চারণ

কিংবা শ্রবণের সময়ে খুশু-খুযু এবং ধ্যানমগ্নতা ও প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনা প্রকাশ করা। এ বিষয়টি বহু সাহাবায়ে কেরাম ও আসলাফের আমল দ্বারা সুপ্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ–হযরত আনাস (রা.) একদিন 'কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলতে গিয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলেন, এমনকি তাঁর কাপড়ও দুলতে লাগল।

এ ধরনের অবস্থা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অত্যধিক মুহব্বত ও তা'যীম থেকে সৃষ্টি হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের মুহব্বত ও তা'যীম এবং ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন কেমন ছিল? তার আলোচন অতিসত্বর করা হবে।

৬. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দর্শন লাভে ধন্য হওয়ার যাওক-শাওক, আকুলতা-ব্যাকুলতা :

প্রত্যেক আশেক স্বীয় মাশুকের মিলন ও দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রেমিকদের কী অবস্থা হবে! সে চাইবে প্রিয় হাবীবকে দুনিয়াতে স্বপ্নযোগে দেখে চির ধন্য হতে এবং আখেরাতে সাক্ষাৎলাভে চির সৌভাগ্যবান হতে। তাই তো অনেকে বলেছেন, মাহবুবের প্রতি আশেকের ইশতিয়াক, আকুলতা ও ব্যাকুলতার নামই মুহব্বত।

এ বিষয়ে হযরত বিলাল (রা.)-এর এক প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। যখন হযরত বিলাল (রা.) মৃত্যুশয্যায়, তখন হযরতের বিবি সাহেবার মুখ থেকে পেরেশানির কারণে এ শব্দটি বের হলো,

وا حرباه

হায়! আমার ঘর উজাড় হয়ে গেল। তার প্রতিউত্তরে হযরত বিলাল (রা.) বললেন,

واطربـاه، غـدا ألـقـى الأحبة محمدا وصحبه

"আহা! হে আমার আনন্দ! আগামীকাল আমি আমার প্রিয় ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হব; হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে।"

৭. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমা)-এর ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা :

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করা মূলত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বেশি বেশি স্মরণ করা, অত্যধিক তা'যীম ও শ্রদ্ধা এবং মিলিত হওয়ার প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনা থেকে উৎসারিত হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর ওপর দরূদ পড়েন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো এবং যথাযথ সালাম প্রেরণ করো।" (আল আহযাব : ৫৬)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে তার ওপর আল্লাহ তা'আলা দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।" (মুসলিম শরীফ, হাদীস-৯৩৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশদ করেন, 'জিবারাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে বলেছেন,

"إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي :أَلَا أُبَشِّرُكَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ :مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ "

"আমি কি আপনাকে সুসংবাদ প্রদান করব না! আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আপনার ওপর দরূদ পাঠ করবে, তার ওপর আমি রহমত নাযিল করব। আর যে ব্যক্তি আপনার ওপর সালাম পাঠাবে তার ওপর আমি সালাম নাযিল করব।" (মুসানাদে আহমদ, হা. ১৬৬২)

রাসূলুল্লাহ করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো ইরশাদ করেন,

عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه : أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال :أَوْلَى النَاسُ بى يوم القِيامَةِ أَكثَرُهُمْ عَلَيَّ صلاة

"কিয়ামত দিবসে তারাই আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, যারা আমার ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করে।" (তিরমিযী, হা. ৪৮৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আশেকীনদের জন্য নিম্নোক্ত হাদীসটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

وقال النبى من صلى على بلغتنى صلاته وصليت عليه وكتبت له سوى ذلك عشر حسنات

"যে ব্যক্তি আমার ওপর দরূদ পাঠ করেছে, তার দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়, আর আমি তার জন্য রহমতের দু'আ করি। এ ছাড়া তার জন্য অতিরিক্ত দশ নেকী লেখা হয়।

(আল-মু'জামুল আওসাত, হা. ১৬৪২)

সুতরাং বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পাঠ করা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মোনাজাত করার ন্যায়। যখন আপনি বলেন,

আল্লাহুম্মা ছাল্লী 'আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া সাল্লামা", তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন, "সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া ফুলান" (আল্লাহ তা'আলা তোমার ওপর রহমত বর্ষিত করুন)

রাব্বে কারীম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কলব মোবারককে আমাদের দিকে ফিরিয়ে দিন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আমাদের পক্ষ থেকে সে উত্তম প্রতিদান দান করুন, যা আপনি উম্মতের পক্ষ থেকে স্বীয় নবীদের দিয়ে থাকেন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

সপ্তম বর্ষে আল-আবরার : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

মাওলানা কাসেম শরীফ

আলহামদুলিল্লাহ, মাসিক 'আল-আবরার' সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ছয় বছরে মাসিক আল-আবরারের ৭২টি সংখ্যা বের হয়েছে। প্রতিটি সংখ্যায় প্রায় ১০ থেকে ১৫টি লেখা ছাপা হয়েছে। সে হিসেবে আল-আবরারে প্রকাশিত লেখার সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি। বিষয়টি আল-আবরার পরিবারের জন্য যেমন প্রেরণাদায়ক, তেমনি এর পাঠকের জন্য পরম তৃপ্তিদায়ক। প্রেরণা ও তৃপ্তি এ জন্য যে হাজার লেখা ছাপিয়ে আল-আবরার এখন সপ্তম বর্ষে উপনীত। বাণিজ্যিক উচ্চাভিলাষ ও বিজ্ঞাপননির্ভর না হয়েও একটি পত্রিকা টিকে থাকতে পারে, মাসিক আল-আবরার সেই নজির স্থাপন করেছে। আল-আবরার মাথা উঁচু করে টিকে আছে এবং সে তার সপ্তমবর্ষ উদ্‌যাপন করছে, সেটা অপার বিস্ময়!

সাত বা সপ্তম শব্দটির তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় 'লাকি সেভেন' শব্দদ্বয়ে। কথিত আছে, ইংরেজি বর্ণের সপ্তম সংখ্যা হলো G। G-তে হয় God। এর অর্থ প্রভু, স্রষ্টা ও ঈশ্বর। বলা হয়ে থাকে, এটি ইহুদি-খ্রিস্টানদের 'শব্দ সন্ত্রাস'। তার মানে কি সাত অশুভ সংখ্যা? আসলে ইসলামে অশুভ বলতে কিছু নেই। আবার শুভ নিয়্যাত ও সুধারণা ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত। তা ছাড়া এ বিষয়ে ভিন্ন মত দিয়েছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ডেইলি মেইল পত্রিকা। ১০ এপ্রিল ২০১৪ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে পত্রিকাটি জানিয়েছে : 'Lucky 7' is the world's favourite number. There are seven days of the week, seven colours of the rainbow, seven notes on a musical scale, seven seas and seven continents.

অর্থ : লাকি সেভেন বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় সংখ্যা। এর কারণ হলো, সপ্তাহ হয় সাত দিনে। বৃষ্টির রং সাতটি। বাদ্যযন্ত্রের সাতটি তরঙ্গ হয়। সাগর সাতটি। আর রয়েছে সাত মহাদেশ।

সুতরাং সাত বা সপ্তম সংখ্যা তাৎপর্যবাহী হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। এই তাৎপর্য মাসিক আল-আবরারের জন্যও!

'সাত সমুদ্র'–এ কথাও বাংলায় বেশ প্রচলিত। মাসিক আল-আবরার জাগতিক সাগর খননের দায়িত্ব নেয়নি, কিন্তু কোরআন ও হাদীসের সাগর সেঁচে অজস্র মণিমুক্তা বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, সাত সংখ্যার সঙ্গে অলৌকিকতারও সংযোগ আছে। হয়তো সে কারণেই মহান আল্লাহ সাত আসমান ও সাত জমিন সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

অর্থ : 'আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ ও এগুলোর অনুরূপ জমিন। এগুলোর (আসমান ও জমিন) মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ, যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। এবং জ্ঞানে আল্লাহ সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছেন।' (সূরা : তালাক, আয়াত : ১২)

কোনো কাজ যদি ইখলাসের ওপর ভিত্তি করে করা হয় এবং তার জন্য উপযুক্ত ও সুবিন্যস্ত কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তার থেকে প্রাপ্যের পরিধিও বহুগুণ বেড়ে যায়। এ কথাটা বোঝাতেও কোরআন সাত সংখ্যাটি বেঁচে নিয়েছে! ইরশাদ হয়েছে,

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : 'যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর পথে (ইখলাসের সঙ্গে) ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শিষ উৎপাদন করে। প্রত্যেক শিষে এক শ শস্যদানা। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন।' (সূরা : বাকারা, আয়াত : ২৬১)

এ আয়াতের মূল ভাষ্য হলো, ইখলাসের সঙ্গে মানবতার কল্যাণকামী কোনো কাজ করা হলে তা সাত থেকে সাত শ, বরং ইখলাসের ব্যাপ্তির কারণ সাত সমুদ্রে পরিণত হয়।

এবার যদি আমরা পেছনে ফিরে তাকাই, তাহলে মাসিক আল-আবরার সম্পর্কে সাতটি তথ্য প্রাক-স্মরণীয়।

এক. এই পত্রিকার স্বপ্নদ্রষ্টা ফকীহুল মিল্লাতি ওয়াদ্‌ দ্বীন মুফতি আবদুর রহমান (রহ.)। দ্বীনের প্রচারে, উম্মাহর কল্যাণে অকাতরে বিলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অনুরাগ সর্বজনবিদিত। অর্থকড়ি আর বাণিজ্যিক এজেন্ডা নিয়ে তিনি যে কোনো কাজ করতেন না, এ কথা তাঁর সমালোচকরাও বিশ্বাস করেন।

এ কথাটা আলাদা করে এ জন্য বলতে হলো যে আত্মপ্রচার, এজেন্ডা বাস্তবায়ন ও অর্থোপার্জনের তাগিদ ছাড়া কোনো পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও মিডিয়া খোলার নজির এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ফকীহুল মিল্লাত মুফতি আবদুর রহমান

(রহ.)-এর স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা এখানেই! মাসিক আল-আবরারের প্রথম সংখ্যায় তাঁর জবানিতে বিবৃত হয়েছে : 'এই সাময়িকীর উদ্দেশ্য হলো, এর দ্বারা সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তথা বিশিষ্টজন ও সর্বসাধারণের মধ্যে দ্বীনের জযবা সৃষ্টি করা ও দ্বীনমুখী করা। যদ্দরুন সর্বসাধারণ ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত হয় ও সবার সঙ্গে ধর্মীয় বন্ধন দৃঢ় থেকে সুদৃঢ়তর হয় এবং ইসলামের সর্বজনীনতা ও স্থায়িত্ব প্রমাণিত হয়।'
(তথ্য সূত্র : মাসিক আল-আবরার, প্রস্তুতিমূলক সংখ্যা, রবিউল আউয়াল, ১৪৩৩ হিজরি, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ)

দুই. এই পত্রিকার নামকরণ করা হয়েছে থানভী সিলসিলার সর্বশেষ জ্যোতি মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক (রহ.)-এর নাম অনুসারে। এই নামকরণের মধ্য দিয়ে মাসিক আল-আবরারের আধ্যাত্মিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই নামকরণ এ বার্তা দেয় যে আল-আবরার কোরআন-সুন্নাহ, আসহাবে রাসূল, আকাবির ও আসলাফের রেখে যাওয়া আমানতের উত্তরাধিকারী। তাঁদের কর্মপন্থাই আল-আবরারের কর্মকৌশল।

তিন. প্রতিটি পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের নিজস্ব স্লোগান থাকে, যদিও সবার কথা ও কাজের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর; কিন্তু আল-আবরারের কর্মপন্থা লক্ষণীয়। মাসিক আল-আবরারের স্লোগান হলো 'দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধিমূলক সাময়িকী'। এ থেকে এটা স্পষ্ট, আল-আবরার ইসলাম প্রচার এবং ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারে জোর দেয়। একেবারে শুরুর দিন থেকে সর্বশেষ প্রকাশিত সংখ্যায় আমরা দেখতে পাই, মাসিক আল-আবরার কথা রেখেছে। প্রতি সংখ্যায় বিভিন্ন গবেষণামূলক লেখার পাশাপাশি অলি-আউলিয়ার 'ইফাদাত' ও বুযুর্গদের মহামূল্যবান বাণীর আলোকে মাসিক আল-আবরারকে সাজানো হয়েছে।

চার. বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় অর্ধশত মাসিক ইসলামী পত্রিকা বের হয়। সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমরা বলতে পারি, সবচেয়ে সুন্দর অপসেট কাগজে মাসিক আল-আবরার ছাপা হয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন স্বয়ং ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)। তাঁর ভাষায়, 'নিরস ও অসুন্দর কাগজে কোরআন-সুন্নাহর বাণী প্রচার হবে, তা আমি পছন্দ করি না।' (আল-আবরার, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩)

পাঁচ. আল-আবরারের আরেকটি স্বাতন্ত্র্য দিক হলো, এটি সবার জন্য বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয় না। আবার অর্থ সংগ্রহও এর মুখ্য নয়। ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) বলেছেন, 'গতানুগতিক পত্রিকার মতো এটি লাভ-ক্ষতির বিবেচনায় চলবে না। এটি দাওয়াতের নিয়্যাতে প্রকাশ করা হবে। বিনিময়মূল্য থাকবে, তবে অর্থপ্রাপ্তিই এতে উদ্দেশ্য থাকবে না।' (আল-আবরার, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩)

ছয়. এর বিপরীতে গ্রাহকের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আল-আবরারের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা হয় না। কয়েকটি বিজ্ঞাপন শুরু থেকেই আল-আবরারে দেখা যায়; কিন্তু সেগুলোর বিনিময়েও মাসিক নির্দিষ্ট 'বিজ্ঞাপন রেট' অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করা হয় না। একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের মুহব্বত ও ভালোবাসার তোহফা হিসেবে সেগুলো প্রচার করা হয়।

সাত. মাসিক আল-আবরারের প্রথম সংখ্যা বের করা হয়েছে আরবি রবিউল আউয়াল মাস অনুসরণ করে। তাই এর বর্ষশুরুর সংখ্যা জানুয়ারি নয়, ফেব্রুয়ারি!

রবিউল আউয়াল বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও মৃত্যুর স্মৃতিবিজড়িত মাস। আশেকে রাসূলের প্রিয় মাস রবিউল আউয়াল। রবিউল আউয়াল উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীপ্রেমিকের মন মোহিত ও অনুরক্ত হয়। আল-আবরার প্রকাশের জন্য এ মাসকে বেছে নেওয়া কি তাৎপর্যহীন?

আল-আবরারে প্রকাশিত বিশেষ কিছু লেখা

আল-আবরার দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধিমূলক সাময়িকী–এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দাওয়াত ইসলামের চলমান প্রকৃতি। কিয়ামত অবধি ইসলামের দাওয়াত অব্যাহত রাখা আবশ্যক। যদিও ইসলামের শাশ্বত রূপে কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন নেই, কিন্তু যুগ, জায়গা, ভাষা ও পরিবেশে দাওয়াতের কৌশল পরিবর্তন হতে পারে। মাসিক আল-আবরার পরিবর্তিত দুনিয়ার দাওয়াতের নয়ানীতি রপ্ত করেছে। আল-আবরার তার প্রতি সংখ্যা সূচনা করে 'পবিত্র কালামুল্লাহ' ও 'পবিত্র সুন্নাহ' থেকে চয়িত বাণীর মাধ্যমে। এরপর কোরআন ও হাদীসের আলোকে সমসাময়িক মাসায়েলনির্ভর একটি লেখা প্রায় প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় 'দরসে ফিকৃহ' নামে। প্রথম সংখ্যায় 'দরসে ফিকৃহ' রচিত হয়েছে অমুসলিম দেশে মুসলিমদের স্থায়ী নাগরিকত্ব বিষয়ে।

দ্বিতীয় সংখ্যায় মোবাইলে বিয়ের বিধান সম্পর্কে, তৃতীয় সংখ্যায় ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে পিতৃত্ব পরিচয় নির্ধারণ সম্পর্কে, চতুর্থ সংখ্যায় খাদ্য উপকরণ ও ঔষধীয় উপাদান জেনেটিন সম্পর্কে, পঞ্চম সংখ্যায় ইসলামী সংগীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৩ সংখ্যায় 'ফরেক্স ট্রেডিং', মে, ২০১৩ সংখ্যায় শরীয়তের আলোকে ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অক্টোবর ২০১৩ সংখ্যায় টেস্ট টিউব বেবি সম্পর্কে ইসলামের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে পোশাকের শরয়ী নীতিমালা সম্পর্কে ধারাবাহিক অনেকগুলো পর্ব।

দীর্ঘ ফিরিস্তি না টেনে শুধু কয়েকটি লেখা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। এতে যে কেউ বুঝতে পারে যে, মাসিক আল-আবরার শুধু ইসলাম প্রচার

নয়, আধুনিক যুগে ইসলামের ভাষ্যকারের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে।

ইসলাম শাশ্বত ও চিরন্তন ধর্ম। চির নবীন ও প্রবীণ ধর্ম। চির আধুনিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম। সব কিছু বদলায়। ইসলাম বদলায় না। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাওয়া সমাজে ইসলাম কিভাবে টিকে থাকবে, এ প্রশ্ন অনেকের। এর সরল জবাব হলো, ইসলামের মূলনীতি চারটি–কোরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। এর মধ্যে ইজমা ও কিয়াস হলো যুক্তি ও গবেষণানির্ভর। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে কোরআন ও হাদীস অবতীর্ণ হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু নিত্যনতুন যুগজিজ্ঞাসার জবাবে ইজমা ও কিয়াস তথা চিন্তা ও গবেষণার দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা। কিন্তু সেই চিন্তা ও গবেষণা হতে হবে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে। প্রতিটি দেশে, প্রতিটি যুগে ও প্রতিটি ভাষায় নয়া দুনিয়ায় ইসলামের প্রয়োগিক দিক তুলে ধরা সমকালীন আলেমদের প্রধানতম দায়িত্ব। আমরা মনে করি, আল-আবরার সে বিষয়গুলো পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছে, সেগুলো সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের তাগিদ থেকেই।

নানা পথ ও মতে মুসলিম বিশ্ব আজ বেসামাল। কিন্তু সর্বসাধারণের করণীয় কী? এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আল-আবরার প্রতি মাসে 'সীরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথ' হাজির করে। এটি রচনা করেন বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম শায়খুল হাদীস মুফতি মনসূরুল হক।

মাসিক আল-আবরারে প্রকাশিত লেখাগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, সেগুলো কলেবরে একটু বড় হয়ে থাকে। ছোট ছোট করে যেখানে আরো বেশি লেখা দেওয়া যায়, সেখানে কেন এই কর্মপন্থা? এ বিষয়ে আল-আবরার কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হলো, 'আল-আবরার খবরনির্ভর পত্রিকা নয়, এটি গবেষণা পত্রিকা। যে বিষয়ে যে লেখা আল-আবরারে ছাপা হয়, সে বিষয়ে যেন ওই লেখাটি সর্বাধিক তথ্যনির্ভর ও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়, সে উদ্দেশ্যে গবেষণামূলক দীর্ঘ লেখার প্রতি আল-আবরার কর্তৃপক্ষের উৎসাহ। এই গবেষণার পথ ধরে বিভিন্ন বিষয়ে আল-আবরারে এমন অনেক বিষয়ে লেখা ছাপা হয়েছে, যেগুলো পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে, আর কিছু প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। এমন কয়েকটি বিষয় হলো, 'কোয়ান্টাম মেথড', 'মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান', 'রাসূল (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন', 'পোশাক-পরিচ্ছেদ : আহকাম ও মাসায়েল', লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়', 'মাযহাব সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার', 'ভিন্ন চোখে কওমি মাদরাসা, 'মানবাধিকার', 'ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস', ও 'ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন'। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই গবেষণামূলক লেখাগুলো এ বিষয়ে সর্বাধিক তথ্যবহুল সময়োপযোগী লেখা।

আল-আবরার কওমি মাদরাসাভিত্তিক দেওবন্দি চিন্তাধারা লালন করে। এর বিশেষ কারণ আছে। উপমহাদেশে দারুল উলূম দেওবন্দ আবির্ভূত হয়েছে ইসলামের প্রতিনিধি হিসেবে। ১১ এপ্রিল ২০১৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম-উলামার সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। সেখানে তিনি কওমি মাদরাসা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যে কথাগুলো তিনি বলেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কথা হলো–এক. বাংলাদেশে (তথা উপমহাদেশে) শিক্ষার সূচনা হয়েছে কওমি মাদরাসার মাধ্যমে। এটা যদি শুরু না হতো, তাহলে আমরা কেউ শিক্ষিত হতে পারতাম না। দুই. ভারতবর্ষ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূত্রপাত উলামায়ে দেওবন্দ আন্দোলনের মাধ্যমে। তিন. বাংলাদেশে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয় কওমি মাদরাসাগুলোতে।

তাই মাদরাসা, মসজিদ, বিশেষত কওমি মাদরাসার মান উন্নয়ন, ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ, ছাত্র-শিক্ষকের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে মাসিক আল-আবরারের আগ্রহ আছে। এ বিষয়ে ছাপা হওয়া লেখার সংখ্যাও প্রচুর। কিন্তু আল-আবরার দেওবন্দকেন্দ্রিক ফেরকাবন্দির পক্ষপাতবিরোধী। তাই আল-আবরার এই শিরোনামেও একটি লেখা ছাপতে সক্ষম হয়েছে যে 'দেওবন্দিয়াত–এটি কোনো ফেরকা নয়'। (সেপ্টেম্বর, ২০১৩)

আল-আবরারের একটি নিয়মিত বিভাগ হলো 'জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান'। যে কেউ এ বিভাগে প্রশ্ন পাঠাতে পারে ও ইসলামের আলোকে এর সমাধান জেনে নিতে পারে।

আল-আবরার ও কোয়ান্টাম মেথড

মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে কথিত ধ্যানমগ্ন করার নামে অভিনব প্রতারণার নাম হলো কোয়ান্টাম মেথড। হাজার বছর আগে ফেলে আসা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান পাদ্রি ও যোগী-সন্ন্যাসীদের যোগ-সাধনার আধুনিক কলা-কৌশলের নাম দেওয়া হয়েছে 'মেডিটেশন'। হতাশাগ্রস্ত মানুষকে সাময়িক প্রশান্তির সাগরে ভাসিয়ে এক কল্পিত দেহভ্রমণের নাম দেওয়া হয়েছে Science of Living বা জীবনযাপনের বিজ্ঞান। আকর্ষণীয় কথার ফুলঝুরিতে বিত্তবান সাধারণ শিক্ষিত মানুষরা এদের প্রতারণার ফাঁদে নিজেদের সঁপে দিচ্ছেন অবলীলায়। ব্যয় করছেন কথিত ধ্যানের পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঢেলে দিচ্ছেন হাজার হাজার টাকা। অথচ একটা রঙিন স্বপ্ন ছাড়া তাঁদের ভাগ্যে কিছুই জুটছে না। অন্যদিকে মুসলমান যারা এদের দলে

ভিড়ছে, তারা শিরকের মতো মহাপাপে লিপ্ত হয়ে দুনিয়া ও আখেরাত দুটিই হারাচ্ছে। বাংলাদেশের হাজারো বরং লাখো মানুষ তাদের প্রতারণার শিকার। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা না থাকায় সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক উৎকণ্ঠা ছিল। এমন প্রেক্ষাপটে আল-আবরার এগিয়ে এসেছে। ধারাবাহিক ছেপেছে কথিত মেডিটেশন ও কোয়ান্টাম মেথড সম্পর্কে। এই গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন মারকাযুল ফিকরির ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরার উদীয়মান ফতওয়া গবেষক মুফতি শরীফুল আজম সাহেব। পরে সেই ধারাবাহিক লেখাগুলো বই আকারে বের হয়েছে। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত

বাংলাদেশে দ্বিতীয় কোনো বই নেই। এর কারণ হয়তো এই যে বইটি বাজারে আসার পর এ বিষয়ে আর কোনো বই লেখার প্রয়োজনীয়তাই অবশিষ্ট নেই! বইটি এতই পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে কোনো আল্লাহর বান্দা বইটির ইন্টারনেট সংস্করণ বের করে লাখো-কোটি পাঠকের জন্য তা পাঠ করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন।

আহলে হাদীসের নয়া ফিতনা ও আল-আবরারের ভূমিকা

'ফিতনা' শব্দটি আরবি ভাষার। এর অর্থ নৈরাজ্য, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অন্তর্ঘাত, চক্রান্ত, বিপর্যয়, পরীক্ষা প্রভৃতি। অভিধানবিদ আযহারী বলেন, আরবি ভাষায় ফিতনার সামগ্রিক অর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আগুনে পুড়িয়ে সোনার আসল-নকল ও মান যাচাই প্রক্রিয়া বোঝাতে ফিতনা শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতেও এরূপ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 'সেদিন তাদের আগুনে পোড়ানো হবে (সূত্র : তাহযিবুল লুগাহ, ১৪/২৯৬)।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.)-এর মতে, ফিতনা হলো ওই বস্তু, যার ফলে মানুষের পক্ষে দ্বীন বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। (মালফুজাতে কাশ্মীরি)

'ফিতনা'র বেশির ভাগ অর্থের প্রায়োগিক জায়গা মানুষের সামষ্টিক জীবন। নৈরাজ্য থেকে বিপর্যয় পর্যন্ত উপর্যুক্ত শব্দগুলোর বিমূর্ত ভাব সমষ্টিগত জীবনেই মূর্ত বাস্তবতা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। দিয়াশলাইয়ের ক্ষুদ্র আগুন যেমন ক্রমেই বিস্তৃত হয়ে বিশাল এলাকা ছারখার করে দিতে পারে, ফিতনাও তাই। এর বহুমাত্রিক ধ্বংসক্ষমতাকে বোঝাতে আগুনের উপমা জুতসই। বর্তমান বাংলাদেশে আহলে হাদীস নামধারী এক শ্রেণির লোকের বেশ কিছু তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। মুখরোচক ও শ্রুতিমধুর স্লোগান দিয়ে তারা সমাজের শিক্ষিত মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। মুখে তারা কোরআন-হাদীস ও সহীহ ইসলামের কথা বললেও নাউজুবিল্লাহ তারা কাজেকর্মে কোরআন-হাদীস সংস্কার আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। ইন্টারনেটভিত্তিক তাদের কর্মকাণ্ড খুব দ্রুত সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এতে সর্বসাধারণের পক্ষে দ্বীন বোঝা ও সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাচাই করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে মাসিক আল-আবরার তথাকথিত আহলে হাদীসের মুখোশ উন্মোচন করেছে। যেসব বিষয়ে তারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, সে বিষয়ে সর্বাধিক তথ্যসংবলিত লেখা একের পর এক প্রকাশ করেছে।

মাসিক আল-আবরার জাতির সামনে বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে যে মাযহাব মানা মানে কোনো ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণ নয়। বরং কোরআন-সুন্নাহর বাহ্যত বিরোধের ক্ষেত্রে একজন যুগশ্রেষ্ঠ ইমামের অভিমত গ্রহণ করে কোরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা। আহলে হাদীস দাবিকারী আমাদের মুসলমান ভাইদের অনেকে সূরা ফাতেহা শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না, কিন্তু 'আমিন' আস্তে নাকি জোরে, এ বিষয়ে তাঁর ঘুম হারাম। অথচ 'আমিন' একেবারে না বললেও নামায হয়ে যায়, কিন্তু নামাযের কেরাত অশুদ্ধ হলে নামাযই হয় না।

মাযহাব মানার বিষয়টি কেমন, ছোট একটি উদাহরণ দিই : আমাদের প্রিয় নবীর নাম বাংলায় চার ভাবে লেখা হয়ে থাকে–মুহাম্মদ, মুহাম্মাদ, মোহাম্মদ, মোহাম্মাদ। অথচ কোনোটিই অশুদ্ধ নয়। বরং একটি ভাষারীতি অনুসরণ করে লেখাটাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত কথা হলো, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মতবিরোধ থাকতেই পারে, তবে কখনো মনোমালিন্য না হওয়া চাই। আমরা জানি, সাহাবি, তাবিয়ি এবং পুণ্যবান পূর্বসূরিদের সময়ও এমন শাখাগত মাসায়েল নিয়ে ইখতিলাফ বা মতবিরোধ বিরাজমান ছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়নি।

কেন এই বিরোধ তৈরি হলো, এর দুটি কারণ রয়েছে। এক. ইসলাম বৈশ্বিক ধর্মের রূপ নেবে, এটাই ছিল আল্লাহর মর্জি। তাই শুরু থেকেই বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ার উপযোগী করে প্রশস্ততা রেখে বিভিন্ন অবকাশ দিয়ে ইসলামের বিধান দেওয়া হয়েছে।

দুই. কোরআন-সুন্নাহ সস্থানে সঠিক। কিন্তু বৈচিত্র্য রং, ভাষা ও চিন্তার মানুষ যখন কোনো বিষয়ে জড়িয়ে যায়, সেখানে মতভেদ সৃষ্টি হয়। বিশেষ হিকমতের কারণে নানা রং, শ্রেণি, পেশা, বিশ্বাস ও আদর্শের মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে সব মানুষকে এক জাতি বা মুসলমান হতে বাধ্য করতেন। আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করলে সবাই এক জাতিতে পরিণত হতো। তখন কোনো মতভেদও থাকত না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নানা পথ ও মতের মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়েছেন। চিন্তার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

যুগে যুগে সত্য ও সরল পথ প্রদর্শনের জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাই মানুষ স্বাধীনভাবে তার পথ নির্বাচন করবে–এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি মানুষের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান রেখেছেন। যারা নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কাজে লাগিয়ে সৎ পথ অবলম্বন করবে, তারা পুরস্কৃত হবে, আর যারা তা করবে না, তারা শাস্তি পাবে। কাজেই সৃষ্টিগত নিয়মেই মানুষের মধ্যে মত-দ্বিমত বিদ্যমান। কোনো কিছুর বিনিময়ে এ বিরোধ রোধ করা যাবে না। এ বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা হবে পরকালে। ইরশাদ হয়েছে,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

'তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সব মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে।' (সূরা : হুদ, আয়াত : ১১৮)

এ বিষয়ে হাদীসের একটি ঘটনা স্মরণীয়। নবীজি (সা.) আহজাব থেকে ফিরে সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাতকে বনি কুরাইজায় এই বলে পাঠালেন যে তোমাদের কেউ যেন বনি কুরাইজায় না পৌঁছা পর্যন্ত আসরের নামায না পড়ে। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেখানে পৌঁছতে দেরি হওয়ায় পথিমধ্যে আসরের নামাযের সময় ঘনিয়ে আসে। তখন একদল সাহাবী [রাসূল (সা.)-এর আদেশের প্রতি লক্ষ করে] বললেন, আমরা বনি কুরাইজায় পৌঁছার আগে আসরের নামায আদায় করব না। কিন্তু আরেক দল সাহাবী [রাসূল (সা.)-এর আদেশের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ করে] বললেন, আমরা আসরের নামায রাস্তায় পড়ে নেব। কেননা রাসূল (সা.) আমাদের এই নির্দেশনা আক্ষরিক নয়। (বরং রাসূলের উদ্দেশ্য হলো, আমরা যেন অতিদ্রুত বনি কুরাইজায় যাই এবং আসরের নামায সেখানে গিয়ে পড়ি। কিন্তু আমাদের পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়। তাই আসরের নামায কাজা করব না)। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানানো হলে তিনি কোনো দলকেই তিরস্কার করেননি। (সহীহ বোখারী, হাদীস : ৩৮৩৫) এখানে আদেশ ও আদেশদাতা একই হওয়া সত্ত্বেও উপলব্ধি ভিন্ন হওয়ায় আদেশ পালনে মতভেদ দেখা দিয়েছে।

ইমাম মালিক (রহ.) (মৃ. ১৭৯ হি.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত, তিনি যখন 'মুয়াত্তা' সংকলন করেন তখন খলিফা মানসুর (কোনো বর্ণনা মতে অন্য খলিফা) আরজ করেন, আপনি অনুমতি দিলে আমি প্রতিটি দেশের গভর্নরের কাছে এ মর্মে লিখে পাঠাব যে সবাই যেন এই কিতাবের হাদীস অনুযায়ী আমল করেন এবং বিচারকার্য সম্পাদন করেন। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, 'রাসূল (সা.) এই উম্মাহকে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। জিহাদের জন্য তিনি বাহিনী পাঠাতেন, নিজেও বের হতেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তেমন বেশি দেশ বিজিত হয়নি। তাঁর পরে হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন; তখনো বিজিত অঞ্চলের সংখ্যা কম ছিল, তারপর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর খিলাফতকালে বহু দেশ বিজিত হয়। আর তখন ওই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বীনি তা'লীমের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে মুয়াল্লিম ও শিক্ষক হিসেবে পাঠানো ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। সুতরাং প্রতিটি অঞ্চলের মুসলমানরা স্বীয় মুয়াল্লিম সাহাবী থেকে যা শুনেছেন, শিখেছেন তার ওপরই আমল করতে লাগলেন। এ নিয়মই পরবর্তী সময়ে অব্যাহত ছিল। অতএব এখন যদি আপনি লোকদের নিজ অঞ্চলের আমল ছাড়া অজানা নতুন কোনো আমলের দিকে আহ্বান করেন, তাহলে তারা এটাকে কুফরী গণ্য করবে। তাই আপনি প্রতিটি অঞ্চলে প্রচলিত ইলম ও আমলের ওপরই লোকদের ছেড়ে দিন। আর এই ইলম (মুয়াত্তা) নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারেন। তখন খলিফা বলেন, আপনি দূরদর্শী কথা বলেছেন।' (তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তা'দিল, ইবনে আবি হাতিম, পৃ. ২৯, [আদাবুলিখতিলাফ; শায়খ আওয়ামা, পৃ. ৪০-এর সূত্রে] আত তাবাকাতুল কুবরা; ইবনে সা'দ, [আল জুযউল মুতাম্মিম] পৃ. ৪৪০-৪৪১, মদীনা মুনাওয়ারাহ, ১৪০৩ হি.)

শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) (মৃ. ৭২৮ হি.) লিখেছেন, 'ইজতিহাদি বিষয় নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। যে অঞ্চলে যে সুন্নাত চালু আছে, সেখানে সেভাবেই চলতে দেওয়া উচিত। ভিন্ন কোনো সুন্নাত চালু করা ফিতনা সৃষ্টি করার শামিল। এ জন্যই খলিফা যখন ইমাম মালিক (রহ.)-এর কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন যে আমি সবাইকে আপনার 'মুয়াত্তা'-এর হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হুকুম জারি করে দিই? ইমাম মালিক (রহ.) তাঁকে বারণ করে বলেন, এটা ঠিক হবে না; কারণ সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং প্রতিটি জনপদের কাছে এরই মধ্যে কিছু হাদীস পৌঁছে গেছে।' (মাজমূউল ফাতাওয়া; ইবনে তাইমিয়া, ৩০/৭৯)

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) অন্যত্র বলেন, 'মানুষের জন্য উচিত হলো, এ ধরনের মুস্তাহাব তরক করে হলেও অন্যের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা। কারণ ইসলাম ধর্মে এ রকম মুস্তাহাব বিষয়ের চেয়ে অন্যের মন খোশ রাখার গুরুত্ব আরো বেশি। যেভাবে রাসূল (সা.) বায়তুল্লাহ আসলরূপে পুনর্নির্মাণের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেননি; লোকদের মন জয় করার স্বার্থে। যেভাবে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সফর অবস্থায় নামায পূর্ণ পড়তে হযরত উসমান (রা.) এর প্রতিবাদ করলেন, আবার তিনি নিজেই তাঁর পেছনে মুসাফির অবস্থায় পূর্ণ নামায আদায় করলেন। তারপর

বললেন, ঝগড়া-বিবাদ নিকৃষ্টতম বিষয়।' (মাজমূউল ফাতাওয়া : ২২/৪০৭)

সুতরাং মক্কা-মদীনায় কে কী করে, কিভাবে নামায পড়ে, সেটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। মদীনার ইমাম মালেক (রহ.) কখনো চাননি, অন্য জায়গার মানুষও হুবহু তাঁর ব্যাখ্যা অনুসরণ করুক।

মুসলিম উম্মাহর কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে প্রায় বেশির ভাগই আরবের বাইরে অনারব মুহাদ্দিসদের কর্তৃক সংকলিত। ইমাম বোখারী (রহ.) উজবেকিস্তানের, ইমাম মুসলিম (রহ.) ইরানের নিশাপুরের, ইমাম নাসাঈ (রহ.) তুর্কমেনিস্তানের, ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ইরানের সিজিস্তানের (খোরাসান), ইমাম তিরমিযী (রহ.) উজবেকিস্তানের, ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) ইরানের কাজওয়িনের।

উপমহাদেশসহ পৃথিবীর বেশির ভাগ মুসলমান হানাফী মাযহাব অনুসরণ করার কারণ হলো, সাহাবায়ে কেরামের পর ইমান আবু হানীফা (রহ.)-এর চেয়ে বড় কোনো ইসলামী পণ্ডিত অতিবাহিত হয়নি। তাই তাঁর ব্যাখ্যা মুসলমানরা বড় করে দেখেছে। মাযহাবের অনুসারীরাও কোরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করে, কিন্তু তারা শুধু কোরআন-সুন্নাহ উপলব্ধি করার জন্য মাযহাবের ইমামদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছে। মাসিক আল-আবরার মানুষের সামনে এ কথাগুলো পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে উপস্থাপন করেছে।

একটি পত্রিকা কি সমাজ বদলাতে পারে?

একটি প্রশ্নের মীমাংসা করে আমরা আলোচনা শেষ করতে চাই। প্রশ্ন হলো, একটি মাসিক পত্রিকা সমাজের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে? আসলে কতটা প্রভাব বিস্তার করে, এর যোগ-বিয়োগ না করেও বলা যায়, একটা প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করতে পারে। কেননা প্রতিটি ক্রিয়ার একটি প্রতিক্রিয়া অবশ্যই থাকে। একটু পেছনে ফিরে যাই। বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা। ধর্মান্তকরণের মিশন নিয়ে মিশনারিরাই বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকী বের করে। ১৮১৮ সালে মিশনের পক্ষে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র 'দিগ্‌দর্শন'। এর ২৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে ইংরেজি প্রবন্ধও প্রকাশিত হতো। ১৮২১ সালের পরে এটি বন্ধ হয়ে যায়। 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশিত হওয়ার এক মাস পর (২৩ মে, ১৮১৮) মার্শম্যান প্রকাশ করেন 'সমাচার দর্পণ'। এর সম্পাদনা কাজে সহায়তা করেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারিণীচরণ শিরোমণি প্রমুখ। পত্রিকাটির ফারসি, ইংরেজি ও বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৩২-৩৪ পর্যন্ত পত্রিকাটি ছিল দ্বি-সাপ্তাহিক এবং ১৮৪১ সাল পর্যন্ত এর প্রকাশনা অব্যাহত ছিল। (সূত্র : বাংলাপিডিয়া)

বলার অপেক্ষা রাখে না যে বঙ্গে মিশনারি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

আরেকটি উদাহরণ দিই। বর্তমানে যে আহলে হাদীসের অপতৎপরতা বেড়ে গেছে, আমার পর্যবেক্ষণ হলো, এর বীজ বোপিত হয়েছে সুদূর অতীতে। বর্তমানেও ইন্টারনেটে তারা যেমন সক্রিয়, আরো এক থেকে দেড় শ বছর আগে থেকেই তারা লেখালেখি, পত্রিকা প্রকাশ ও মিডিয়ায় সরব ছিল।

বাংলা পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁকে বলা হয় মুসলিম বাংলার 'সাংবাদিকতার জনক'। তিনি ছিলেন আহলে হাদীস। শুধু আহলে হাদীসের মতবাদ প্রচারের জন্য আরো এক শ বছর আগে তিনি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছেন। ১৯১০ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রথমে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ সময় থেকে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর কর্মজীবনের শুরু। এরপর মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ 'আল ইসলাম' নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২২ সালে কংগ্রেসের অসহযোগিতা আন্দোলনের প্রাক্কালে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ 'মোহাম্মদী' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। কিন্তু সরকার অল্প দিনের মধ্যেই এ পত্রিকাটিও বন্ধ করে দেয়। অতঃপর ১৯৩৭ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর পরিচালনায় ও সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সম্পাদনায় 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা বাঙালি মুসলমানের প্রথম দৈনিক পত্রিকা। এ পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক জাগরণ, সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তার প্রতিফলন ঘটে। এগুলোর পাশাপাশি মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর লালিত লা-মাযহাবী চিন্তার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছেন। (সূত্র : সাহিত্য ত্রৈমাসিক 'প্রেক্ষণ', মাওলানা আকরম খাঁ স্মরণ, জুলাই-সেপ্টেম্বর -২০০৫)

আল-আবরারের সম্পাদকীয় নীতিমালা

সাংবাদিকতা ও লেখালেখি ইসলামের শাশ্বত দাওয়াতি কার্যক্রমের অংশ। সে লক্ষ্যেই মহানবী (সা.)-এর আগমন। ইরশাদ হয়েছে,

هُوَالَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

অর্থ : 'তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন অন্য সব ধর্মের ওপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।' (সুরা :

তাওবা, আয়াত : ৩৩)

ইসলামী সাংবাদিকতা বা ইসলামের আলোকে সাংবাদিকতার প্রধান লক্ষ তিনটি–এক. 'দাওয়াত ইলাল খাইর' তথা আল্লাহর পথে আহ্বান। দুই. সৎ, সত্য ও ন্যায়ের আদেশ। তিন. অসৎ, অসত্য ও অন্যায় থেকে বাধা প্রদান। তবে প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইসলামী সাংবাদিকতার আরো কিছু বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা রয়েছে।

সাংবাদিকতা পবিত্র আমানত :

সাংবাদিকতা পবিত্র আমানতস্বরূপ। তাই সাংবাদিক ও লেখকের দায়িত্ব হলো, যেকোনো তথ্য ও সংবাদকে বস্তুনিষ্ঠভাবে গণমাধ্যমে তুলে ধরা। কোনোরূপ সংযোজন-বিয়োজন ছাড়াই সংবাদ পরিবেশন করা ও সংবাদের অঙ্গসজ্জায় কেবল নিরেট সত্যকেই তুলে ধরা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَقُولُواقَوْلًاسَدِيدًا

অর্থ : 'হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও সঠিক কথা বলো।' (সুরা আহজাব, আয়াত : ৭০)

'জায়গার অভাব', 'এমন লেখা ছাপলে চাপ আসবে'–এ ধরনের কথা গণমাধ্যমে বহুল প্রচলিত। কিন্তু মাসিক আল-আবরার একান্ত অপারগ না হলে সংযোজন-বিয়োজন ও কোনো হস্তক্ষেপ করে না। আল-আবরারের নিয়মিত লেখকরা বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

খবরের সত্যতা যাচাইয়ে জোরদার :

সংবাদের তথ্য যাচাই ও সত্যতা নিরূপণ করা সাংবাদিকের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُواإِن جَاءكُم فَاسِقٌ بِنَبَإٍفَتَبَيَّنُواأَن تُصِيبُواقَوْمًابِجَهَالَةٍفَتُصْبِحُواعَلَى مَافَعَلْتُم نَادِمِينَ-

অর্থ : 'হে মুমিনরা, যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে। যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে যাতে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হতে না হয়।' (সুরা হুজরাত, আয়াত : ৬)

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন,

كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ماسمع

অর্থ : 'যা শুনেছে, তা-ই (যাচাই করা ছাড়া) বর্ণনা করা মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।' (মুসলিম শরিফের ভূমিকা : ১/১০৭; আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৯২)

আল-আবরারের নীতি হলো, এখানে কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স ছাড়া কোনো লেখা ছাপা হয় না। এমনকি সম্পাদকীয় বিভাগের বাইরের অভিজ্ঞ মুফতি ও হাদিসবিশারদদের মাধ্যমে তথ্যগুলো যাচাই করা হয়। লেখার ক্ষেত্রে মুসলিম মনীষীদের অভিমতের পরিবর্তে কুরআন ও হাদীসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে।

হীন স্বার্থে কারো চরিত্রে কালিমা লেপন নিষিদ্ধ :

ব্যক্তিগত আক্রোশে কাউকে হেয় করার মানসে কারো একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরা ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا

অর্থ : 'কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ কখনো যেন তোমাদের সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে।' (সুরা মায়েদা, আয়াত : ৮)।

মাসিক আল-আবরার এ যাবৎ আক্রোশ ও বিদ্বেষমূলক কোনো লেখা ছাপানোর নজির নেই।

যথোপযুক্ত শব্দচয়ন ও বাক্যের ব্যবহার

সাহিত্য ও সাংবাদিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উদ্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপনে যথাযথ শব্দচয়ন বক্তব্য হৃদয়ঙ্গমে সহযোগিতা করে। আর যথার্থ শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে ব্যর্থ হলে ভুল বোঝাবোঝি ও জনমনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। পবিত্র কোরআনের শব্দশৈলী ও ভাষিক উৎকর্ষতা তৎকালীন আরবকে কেবল মুগ্ধই করেনি; সবার কাছে অলৌকিক ও অপার বিস্ময়কর হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। মিডিয়ায় দাওয়াতি কার্যক্রমে হেকমত অবলম্বনের পন্থা হলো, যুগের ভাষা রপ্ত করে সঠিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শব্দ চয়ন করা। কেননা ইসলামী সাংবাদিকতা দাওয়াত ছাড়া কিছুই নয়।

মাসিক আল-আবরার এক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা বানানরীতি অনুসরণের মাধ্যমে ভাষিক শিল্পমান বজায় রাখে।

অপ্রয়োজনে ছবি ব্যবহার নিষিদ্ধ :

অপ্রয়োজনে ছবি তোলা ও তা প্রচার করা ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত অপরাধ। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

"যে ঘরে কুকুর এবং ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।" (বুখারী শরীফ, হাদীছ নং ৪০০২)

বর্তমানে ছবি ছাড়া পত্রিকা ও ম্যাগাজিন হতে পারে, এমন চিন্তা অলীক কল্পনার মতো। কিন্তু মাসিক আল-আবরার ছবিমুক্ত ম্যাগাজিন বের করার ক্ষেত্রে শতভাগ সদিচ্ছা দেখিয়েছে।

মাসিক আল-আবরার একটু দেরি করে এসেছে, তবে এসেই জয়ের মাল্য ছিনিয়ে নিয়েছে। আল-আবরারের প্রধান পাঠকশ্রেণি আলেমসমাজ। তাদের মাধ্যমে আল-আবরারের বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে আপামর জনগণের কাছে। সবেমাত্র সাত। সাতে সাবালকত্ব হয় না। কিন্তু দায়িত্বের নির্দেশনা এসে যায়। অগণিত পাঠকের ভালোবাসা আল-আবরারের দায়িত্ব আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের বিশ্বাস, পরিণত বয়সে আল-আবরার লেখালেখি ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হবে–সে-ই প্রত্যাশা।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহাম্মদ আব্দুল গাফ্ফার
পালং, রামু, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

মসজিদের মেহরাব বরাবর দ্বিতীয়-তৃতীয় তলার ছাদের মধ্যে যে ফাঁকা রাখা হয় এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কী? বিস্তারিত দলিলসহ জানতে চাই।

সমাধান :

মুসল্লিদের ইমাম সাহেবের আওয়াজ শোনার সুবিধার্থে মেহরাব বরাবর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার ছাদে ফাঁকা রাখতে শরীয়ত কর্তৃক কোনো আপত্তি নেই। বরং ভালো। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৭, আল-বাহরুর রায়েক-৫/৪২১, হিদায়া-২/৬৪৪)

প্রসঙ্গ : নামায

মাও. উবাইদুল্লাহ
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব ফজরের নামাযে সূরা আর রহমান তেলাওয়াত করেন এবং فبـــــاى الاء ربكما تكذبان এর ف এর মধ্যে তিন আলিফ মদ করে থাকেন। এখন জানার বিষয় ف এর মাঝে তিন আলিফ মদ করার কারণে নামাযে কোনো ত্রুটি হবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে উল্লিখিত ف কে তিন আলিফ টেনে পড়া ভুল, এখানে কোনো ধরনের মদ নেই বরং হরকত হিসেবে ف এর ওপর যবর রয়েছে, যার উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হবে। তাই অধিকতর মশকের মাধ্যমে শুদ্ধ করে নিতে হবে তবে এর জন্য উক্ত ইমামের নামায ভঙ্গ হবে না। (রদ্দুল মুহতার-১/৬৩০, ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়া-১৪১, ফাতাওয়ায়ে কাসেমিয়া-৬/৬৩০)

প্রসঙ্গ : যাকাত

মুছাম্মৎ লায়লা পারভিন খান
মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি সপরিবারে আমেরিকায় বসবাস করি। রাষ্ট্রীয় নিয়মানুসারে আমাদের মাসিক আয় থেকে ৪০% কর্তন করে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি ফান্ডে জমা রাখা হয়, আর উক্ত অর্থ রাষ্ট্রপক্ষ বিভিন্ন খাতে ব্যয় করে থাকে। যেমন–বৃদ্ধাশ্রম এবং গরিব-মিসকিনদের বিভিন্ন প্রকার সহায়তা প্রদান, তাই প্রশ্ন হচ্ছে যে (ক) সরকার কর্তৃক কর্তিত উক্ত ৪০% অর্থে যাকাতের নিয়্যাত করার দ্বারা যাকাত আদায় হবে কি না? (খ) অবশিষ্ট ৬০% অর্থে পুনরায় যাকাত আসবে কি না? বিধায় উল্লিখিত মাসআলার শরঈ সমাধান জানতে আপনার নেক মর্জি হয়।

সমাধান :

সরকার কর্তৃক কর্তিত উক্ত ৪০% অর্থে যাকাতের নিয়্যাত করার দ্বারা যাকাত আদায় হবে না, অবশিষ্ট ৬০% অর্থের যাকাত আদায় করা জরুরি। (কিফায়াতুল মুফতী-৬/৩১৪, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম-৬/১৪৭)

প্রসঙ্গ : কোরআন খতম

মাও. আব্দুর রহমান
ভাদুঘর মাদরাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

জিজ্ঞাসা :

শুধু দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে অথবা শুধু আখিরাতের উদ্দেশ্যে অথবা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টির উদ্দেশ্যে কেউ যদি কোনো মাদরাসায় ছাত্র দ্বারা কোরআন খতম করায় এবং এর বিনিময়ে কিছু টাকা তাকে হাদিয়াস্বরূপ দেয় তাহলে উক্ত টাকা তার জন্য গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না। মাসআলাটির সমাধান জানিয়ে বাধিত করতে আপনার সুমর্জি কামনা করছি।

সমাধান :

দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করিয়ে বিনিময় দেওয়া-নেওয়া উভয়টি জায়েয, পক্ষান্তরে ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে বা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টির মাঝে আখিরাত মুখ্য উদ্দেশ্য হলে বিনিময় দেওয়া-নেওয়া উভয়টি নাজায়েয। (সূরা বাকারা-৪১, রদ্দুল মুহতার-৬/৫৭, মুসলিম শরীফ-২/২২৪)

প্রসঙ্গ : ওয়াজের ভিডিও

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

জিজ্ঞাসা :

বড় বড় আলেম ও পীর সাহেবের ভিডিও ওয়াজে দেখা ও বড় বড় আন্তর্জাতিক কারী ও হাফেজের ভিডিও কোরআন তেলাওয়াত দেখা ও শোনা জায়েয কি না? মাসআলাটির সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করতে আপনার সুমর্জি কামনা করি।

সমাধান :

শরয়ী বা কানুনী প্রয়োজন ব্যতীত কোনো জীবের ছবি তোলা ও ভিডিও করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষেধ ও হারাম বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত বড় বড় আলেম ও পীর সাহেবকে ওয়াজ কিংবা

আন্তর্জাতিক কারীদের কেরাতের ভিডিও ধারণ দর্শন ও প্রদর্শন সম্পূর্ণ নাজায়েয। এর মাধ্যমে হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী ছড়ানোর সম্ভাবনা বেশি। (বোখারী শরীফ-১০৪২, মুসলিম শরীফ-৯৪৫, আহসানুল ফাতাওয়া-৮/৪৩৭)

প্রসঙ্গ : নকল পণ্য

মুহাম্মদ রাশেদ আল মাহবুব
মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

(১) আমি উৎপাদনমূলক ব্যবসা করতে আগ্রহী। এ নিমিত্তে নিজস্ব পণ্য উৎপাদনের জন্য অথবা নিজস্ব পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বা এ ধরনের কাজের জন্য অন্যের বা অন্য প্রতিষ্ঠানের পণ্য খুলে বা কোনোভাবে বিশ্লেষণ করে সেই পণ্যের উৎপাদন কৌশল বা এসংক্রান্ত বিষয় জানা যাবে কি না? যদি তা জায়েয না হয় তবে বাহ্যিকভাবে দেখে এবং জিজ্ঞাসা করে যতটুকু জানা যায় সেই জ্ঞান ব্যবসায়িকভাবে কাজে লাগানো যাবে কি না?

(২) ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বা বাসাবাড়িতে নিরাপত্তার জন্য বা নজরদারির জন্য সিসি ক্যামেরা লাগানো যাবে কি না? সিসি ক্যামেরাসংক্রান্ত ব্যবসা করা যাবে কি না?

সমাধান-১ :

নিজস্ব পণ্য উৎপাদন বা মান বৃদ্ধির জন্য অন্য প্রতিষ্ঠানের পণ্যের উৎপাদন কৌশল জানা এবং তা ব্যবসায়িক কাজে লাগানো যাবে, তবে অন্য কোম্পানির নাম মোড়ক বা লোগো নকল করা যাবে না। (আবু দাউদ শরীফ-৩৪৫২, রদ্দুল মুখতার-৫/৪৪৮, বাদায়েউস সানায়ে-২/৩৭২)

সমাধান-২ :

শরীয়তসম্মত কোনো ওজর অথবা রাষ্ট্রীয় আইনের বাধ্যবাধকতা ছাড়া ছবি ভিডিও তৈরি সংরক্ষণ, দর্শন বা প্রদর্শন সবই অবৈধ ও গোনাহের কাজ। সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে যেহেতু ভিডিও করা হয় তাই এর ব্যবহার শরীয়ত সমর্থিত নয়, এ ধরনের পণ্যের ব্যবসা পরিহারযোগ্য, তবে নিরাপত্তার বিকল্প কোনো গ্রহণযোগ্য পন্থা না থাকলে সাময়িকভাবে তা স্থাপন করা যেতে পারে এবং প্রয়োজন শেষে ছবিগুলো মুছে ফেলতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা থাকলে বৈধ হবে না। (বোখারী শরীফ-৫৭১৭, ফাতাওয়ায়ে উসমানী-৩/৮৪)

প্রসঙ্গ : তাকবীরে তাশরীক

মুহাম্মদ রোকন
রায়পুরা, নরসিংদী।

জিজ্ঞাসা :

যদি কোনো ব্যক্তি তাকবিরে তাশরিকের দিনগুলোর মধ্যে ফরয নামাযের পর লজ্জার কারণে তাকবিরে তাশরিক জোরে না পড়ে বরং আস্তে আস্তে পড়ে নেয় তাহলে তার তাকবির আদায় হবে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

তাকবিরে তাশরিক অনেকের মতে সশব্দে পড়া ওয়াজিব বিধায় তা সশব্দে পড়া সতর্কতার দাবি। এ ক্ষেত্রে লজ্জার কোনো কারণ নেই। (রদ্দুল মুহতার-৩/৬২, কিফায়াতুল মুফতী-৫/৩০০)

প্রসঙ্গ : কবর জিয়ারত

দেলোয়ার হুসাইন
কিশোরগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমার মাতা-পিতার কবর জিয়ারত করতে আমার খুব ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমি এর সুন্নাত তরীকা জানি না। তাই হুজুর সমীপে আরজ এই যে, দয়া করে আমাকে কবর জিয়ারতের সুন্নাত তরীকা জানিয়ে বাধিত করতে আপনার সুমর্জি কামনা করি।

সমাধান :

কবর জিয়ারতের সুন্নাত তরীকা হলো, কবরস্থানে গিয়ে প্রথমে সম্ভব হলে মাইয়্যেতের মুখোমুখি, অর্থাৎ কিবলাকে পিঠ দিয়ে কবরকে সামনে রেখে দাঁড়াবে এবং সালাম করবে হাদীসে বর্ণিত বাক্যসমূহের কোনো একটি দ্বারা যেমন,

السلام عليكم ياهل القبور يغفرالله لنا ولكم انتم سلفنا و نحن بالأثر۔

অতঃপর সাধ্যানুযায়ী তেলাওয়াত করবে। তবে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরায়ে ইয়াসীন, সূরায়ে তাকাসুর, সূরায়ে কাফীরুন, সূরায়ে ইখলাছ, সূরায়ে ফালাক, নাস ইত্যাদি হাদীসে বর্ণিত আছে। অতঃপর কবরকে পেছনে রেখে বা সরে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে মাইয়্যেতের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করবে। (মিশকাত শরীফ-১/১৫৪, হিন্দীয়া-৫/৩৫, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/২২২)

প্রসঙ্গ : মোবাইল, টিভি ইত্যাদির ব্যবসা

মাও. সাজ্জাদ হোসেন
চুড়িপট্টি, যোশর।

জিজ্ঞাসা :

আমি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে যত দূর সম্ভব শরীয়তের পাবন্দির সাথে চলাচলের চেষ্টা করি। পেশায় একজন ব্যবসায়ী। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানির উৎপাদিত পণ্য পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করি। একইভাবে বিশ্ববিখ্যাত স্যামসাং নামক কোম্পানির সাথে একটি ব্যবসায়িক চুক্তির মাধ্যমে আমার একটি ডিলারশিপ আছে। উক্ত কোম্পানিতে প্রস্তুতকৃত ইলেকট্রনিক্স পণ্যগুলি বিক্রয়ের জন্য আমার একটি ব্র্যান্ড শোরুম আছে, যেখানে স্যামসাং ব্র্যান্ডের সকল ইলেকট্রনিক্স পণ্য যেমন মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট, মাইক্রোওভেন, ওয়াশিং মেশিন, এয়ার

কন্ডিশন, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি বিক্রয় করা হয়। আমার প্রশ্ন হলো, কোনো প্রসাধনী পণ্যের সাথে শরীয়াহ নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্যের মিশ্রণ যদি থাকে বা সন্দেহমূলক যে, কার মধ্যে কী মিশ্রণ আছে কি নেই, তা তো জানা সম্ভব নয়। অমুসলিম জাতির প্রস্তুতকৃত পণ্যের মধ্যে এমনটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। শুধু এমন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ হতে পারে কি না?

অনুরূপ মোবাইল হ্যান্ডসেটের মাধ্যমে ভালো-মন্দের ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে; একইভাবে টিভির ব্যাপারেও ভালো-মন্দ ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে। উভয় ক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে মোবাইল সেট বিক্রি কিংবা টিভি শুধুমাত্র ডিসপ্লে (ডিসপ্লেতে সংযোগ দিলে টিভি দেখা যায় অন্যথায় নয়) বিক্রয়ের ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি না? জানালে খুশি হব।

সমাধান :

আপনার শোরুমের প্রসাধনী পণ্যের মধ্যে হারাম বস্তু মিশ্রণ থাকার প্রবল ধারণা না হলে উক্ত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে অন্যথায় জায়েয হবে না।

আর ইলেকট্রনিক্স পণ্যের মধ্যে টিভির ব্যবহার সাধারণত জায়েজ পদ্ধতিতে না হওয়ায় এর ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি নেই। এ ছাড়া মোবাইলসহ অন্যান্য পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের অবকাশ আছে। (রদ্দুল মুহতার-১/১৫১, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৩/১১৬, ফাতাওয়ায়ে উসমানী-৩/৮৪)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহাম্মদ আব্দুলগফুর
নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা :

মসজিদের জন্য খরিদকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করে অবশিষ্ট জায়গায় মার্কেট তৈরি করে সালামী নিয়ে পজিশন হস্তান্তর প্রসঙ্গে।

জনাব, বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের জামে মসজিদ সরকার বাহাদুর থেকে খরিদ সূত্রে ৩.৮০ (তিন একর আশি ডেসিমেল) জায়গার মালিক। উক্ত জায়গার কিছু অংশে মসজিদ নির্মাণ করা আছে। কিছু জায়গার মধ্যে মার্কেট নির্মাণ করে মার্কেটের দোকান কোনো ব্যক্তিকে ব্যবসার জন্য সালামী নেওয়ার মাধ্যমে পজিশন হস্তান্তর করা যাবে কি না? শরীয়তের আলোকে এর সঠিক সমাধান জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

সমাধান :

কোনো জমি ওয়াক্ফ করার পর তা কিয়ামত পর্যন্ত ওয়াক্ফ হয়ে যায়। প্রশ্নে বর্ণিত সরকার বাহাদুর থেকে খরিদকৃত জমি যেহেতু মসজিদের ওয়াক্ফকৃত জমি বলে বিবেচিত তাই ওয়াক্ফকৃত জমিনে দোকানের পজিশন হস্তান্তর করা কোনোভাবেই জায়েয হবে না। পজিশন হস্তান্তর ছাড়া খালি জায়গায় দোকান নির্মাণ করে স্বল্প মেয়াদে ভাড়া দেওয়া যাবে। (বাহরুর রায়েক-৫/৩৪৫, রদ্দুল মুহতার-৪/৪০২, কিতাবুন নাওয়াযেল-১৩/১২৭)

প্রসঙ্গ : মিরাছ

মুহাম্মদ সেলিম
মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

পিতা জীবিত থাকাবস্থায় তাঁর বড় ছেলে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কোনো সন্তানাদি নেই। কয়েক বছর পর তাঁর বাবা মারা যান। এখন ওই বড় ছেলের বিধবা স্ত্রী স্বীয় শ্বশুরের রেখে যাওয়া সম্পদে অংশীদারের দাবি করে। আমার প্রশ্ন হলো, পুত্রবধূ শ্বশুরের সম্পদে অংশীদারের দাবি করা শরীয়তসম্মত হবে কি না? যদি হয় তাহলে সে কী পরিমাণ অংশ পাবে? জানালে উপকৃত হব।

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে পুত্রবধূ শ্বশুরের সম্পদে মিরাছ সূত্রে কোনো অংশ পায় না বিধায় প্রশ্নের বর্ণণা অনুযায়ী পুত্রবধূ শ্বশুরের সম্পদে অংশীদারের দাবি করা শরীয়তসম্মত নয়। (বাহরুর রায়েক-৭/৩৬৫, হিন্দিয়া-৬/৪৯৭, ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১৪/৪৪১)

প্রসঙ্গ : মাস্তরাতের জামাআত

মুহাম্মদ রাশেদুল হক
কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

বিনীত এই যে, আমাদের দেশের প্রচলিত মাস্তরাতের জামাআত সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কী? এবং মহিলাদের জন্য এলাকায় এলাকায় গিয়ে তা'লীম করার ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

সমাধান :

ইসলামী শরীয়ত দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পুরুষের ওপরই অর্পণ করেছে, মহিলাদের ওপর নয় এবং বর্তমান ফিতনার যুগে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়াও আশঙ্কামুক্ত নয় তাই অভিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম মহিলাদেরকে দাওয়াতের নামে ঘর হতে বের হওয়াকে অবৈধ ও নাজায়েয ফতওয়া প্রদান করেছেন। প্রয়োজনে ঘরের ভেতর নিজ মাহরাম থেকে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত মাস্তরাতের জামাআতের নামে মহিলাদেরকে মাহরাম সাথে থাকাবস্থায় ও তিন দিন বা চিল্লায় বের করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। অতএব ঘরের বাইরে এলাকায় এলাকায় গিয়ে তা'লীম করা শরীয়ত সমর্থিত নয় বিধায় তাও বর্জনীয়। (আদদুররুল মুখতার-১/৮২, বদায়েউস সনায়ে-১/৬৬১, ফতহুল কুদির-১/৩১৮)

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-১৭

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

আল্লাহ তা'আলা নিরাকার এবং সর্বত্র বিরাজমান ৭ :

এই পর্যন্ত আমরা আলোচ্য বিষয়ের দলিল, এতদসংক্রান্ত বাতিল ফেরকাদের কুফরী আকীদা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছি।

মূলত পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে বর্ণিত সিফাতে মুতাশাবিহা তথা অস্পষ্ট ও দ্বিঅর্থবোধক বিশেষণগুলোর অপব্যাখ্যা করেই বাতিল ফিরকাগুলো মুসলমানদের মাঝে কুফরী আকীদা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে যুগ যুগ ধরে। অর্থাৎ এসব বিশেষণের বাহ্যিক অর্থকেই মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ধরে নিয়েছে তারা, যা ইসলামী শরীয়তের একেবারে বিপরীত।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

(হে রাসূল!) তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াত মুহকাম, যার ওপর কিতাবের মূল ভিত্তি এবং অপর কিছু আয়াত মুতাশাবিহ। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা সেই মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে থাকে। উদ্দেশ্য ফিতনা সৃষ্টি করা এবং সেসব আয়াতের তাবীল খোঁজা, অথচ সেসব আয়াতের যথার্থ মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। আর যাদের জ্ঞান পরিপক্ব তারা বলে, আমরা এর (সেই মর্মের) প্রতি বিশ্বাস রাখি (যা আল্লাহ তা'আলার জানা)। সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান। (সূরা আলেম ইমরান ৭)

মুফাসসিরগণ লেখেন, এ সূরায় বিষয়টিকে স্পষ্ট করার বিশেষ কারণ ছিল এই যে নাজরানের যে খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে হাজির হয়েছিল, তারা হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র–এ দাবির সপক্ষে বিভিন্ন দলিল পেশ করেছিল, যার মধ্যে এও ছিল যে খোদ কোরআন মজীদে তাঁকে কালিমাতুল্লাহ (আল্লাহর কলিমা) ও রূহুম মিনাল্লাহ (আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত রূহ) নামে অভিহিত করেছে। এর দ্বারা বোঝা যায় তিনি আল্লাহর বিশেষ গুণ 'কালাম' ও আল্লাহর রূহ ছিলেন। অর্থাৎ তারা এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ করে তা দিয়ে দলিল পেশ করেছে। উল্লিখিত আয়াত তার জবাব দিয়েছে যে কোরআন মজীদই বিভিন্ন স্থানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ তা'আলার কোনো পুত্র-কন্যা থাকতে পারে না এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র বলা শিরক ও কুফরের নামান্তর। এসব সুস্পষ্ট আয়াত ছেড়ে দিয়ে কালিমাতুল্লাহ শব্দটিকে ধরে বসে থাকা এবং এর ভিত্তিতে এমন সব তাবীল ও ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া, যা কোরআন মজীদের মুহকাম আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এটা অন্তরের বক্রতারই পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ.)-কে কালিমাতুল্লাহ বলার অর্থ কেবল এই যে তিনি পিতার মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ তা'আলার কুন (হও) কালিমা (শব্দ) দ্বারা জন্ম লাভ করেছিলেন। যেমন পবিত্র কোরআনের সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে। আর তাঁকে রূহুম মিনাল্লাহ বলা হয়েছে এ করণে যে তাঁর রূহ সরাসরি আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য কুন শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করার অবস্থাটা কেমন ছিল এটা মানব-বুদ্ধির ঊর্ধ্বের বিষয়। এমনিভাবে তাঁর রূহ সরাসরি কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল তাও আমাদের বুদ্ধির অতীত। এসব বিষয় মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। তাই এর তত্ত্ব-তালাশের পেছনে পড়া নিষেধ। কারণ এসব বিষয় মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। অনুরূপ এর মনগড়া তাবীল করে এর থেকে আল্লাহর পুত্র থাকার ধারণা উদ্ভাবন করাও বক্র মেজাজের পরিচায়ক।" (তাফসীরে তাওজীহুল কোরআন)

পৌত্তলিকরা মূলত সৃষ্টিকর্তার আকৃতি সাব্যস্ত করে। অতঃপর আল্লাহর আকৃতিতে মূর্তি তৈরি করেছে। অর্থাৎ মূর্তিপূজার ধারণাটিও মূলত এসেছে তাদের কাছ থেকে, যারা আল্লাহ তা'আলার দেহ ও আকৃতি সাব্যস্ত করেছিল। নাস্তিকরা আল্লাহর সিফাতে মুতাশাবিহাতের বাহ্যিক অর্থ সামনে রেখে আল্লাহ তা'আলার প্রতি চরম কটাক্ষমূলক বক্তব্য দান করে থাকে। তারা তো আল্লাহ ও আল্লাহর বিধানকে কাল্পনিক মনে করেই তথাপি তারা বলে যদি মানি প্রভু আছে, তবে কোরআন-হাদীসের ঘোষণা মতে, আল্লাহ তা'আলা নিজেই দেহ আকৃতিবিশিষ্ট মানুষের মতো। আমরাও মানুষ। সুতরাং আমাদের আর তাঁর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই কারণে দুনিয়াতে প্রভুত্ব বলতে কিছু নেই, থাকতে পারে না। সবাই সমান। (নাউজু বিল্লাহ)। ইহুদি-খ্রিস্টানরা বাহ্যিক অর্থের ভিত্তেতে হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহ তা'আলাকে দেহবিশিষ্ট প্রমাণ করেছে। এসব কারণে এরা সকলে কাফের এবং মুশরিকের অন্তর্ভুক্ত। কাররামিয়ারা একই সূত্রে

এসব সিফাতের বাহ্যিক অর্থ নিয়ে মুসলমান বেসে বিভিন্ন কুফরী আকীদা মুসলমানদের মাঝে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছে। একই সূত্রে সালাফিরা বাহ্যিক অর্থকেই উদ্দেশ্য বলে প্রচার করে কুফরী আকীদাকেই সহীহ আকীদা বলে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে। আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের (মুস্তাশরিকীনদের) যত প্রশ্ন, সবই বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে।

তেমনিভাবে পবিত্র কোরআন-হাদীসে আল্লাহ তা'আলার যে বিশেষণগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে যেগুলো অস্পষ্ট এবং যেগুলো বিভিন্ন অর্থবোধক সেসব গুণাবলি ও বিশেষণের ক্ষেত্রে এমন কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করা যাবে না, যা স্পষ্ট আয়াত ও হাদীসের বিপরীত হবে এবং আল্লাহ তা'আলা জাল্লাশানুহুর শানের খেলাফ হবে।

সে ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সলফে সালেহীনের ঐক্যবদ্ধ মত হলো, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট কোনো বস্তুর সাদৃশ্য নন, সৃষ্টিকুলের কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তা'আলার সত্তার অস্তিত্বের জন্য সৃষ্টির যেমন দেহ আছে, সে দেহের মুখাপেক্ষী আল্লাহ তা'আলা নন। সৃষ্টি যে উপকরণ দ্বারা সৃষ্ট, সৃষ্টির যে আকৃতি বা আকৃতি বলতে সৃষ্টি যা বোঝে, স্থান, কাল, পাত্র। মোটকথা হলো, সৃষ্টির কোনো কিছুর সাদৃশ্যও নন, কোনো কিছুর মুখাপেক্ষীও নন।

এই কারণে যেসব আয়াত ও হাদীস শরীফে আল্লাহ তা'আলার জাত বা সত্তার জন্য এমন কিছুর কথা এসেছে, যেগুলো দ্বারা যেকোনো সৃষ্টির সাদৃশ্য পাওয়া যায়, সেগুলো মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত।

বাতিল ফিরকাগুলো যেহেতু শুধু সেসব মুতাশাবিহাত আয়াতের পেছনেই দৌড়ায়, সেসব আয়াত থেকে বিভিন্ন দলিল বের করে উম্মাহের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভক্তি সৃষ্টি করতে চায় সেহেতু তারা পবিত্র কোরআনের আয়াতে ঘোষিত বক্র অন্তরবিশিষ্ট হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পবিত্র কোরআনে এসেছে আল্লাহর 'ইয়াদ' আছে, আল্লাহর 'রিজল', 'আইন', 'ওয়াজাহ' ইত্যাদি আছে। এসব শব্দের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলার জন্য হাত, পা, চোখ, চেহারা ইত্যাদি সাব্যস্ত করা, এই বাহ্যিক উদ্দেশ্যকেই আয়াত ও হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে প্রচার করা এবং এর জন্য বাহারি দলিলের পেছনে পড়া এটাকেই সহীহ আকীদা বলেই প্রচার করা এসব অন্তরের বক্রতা ছাড়া কিছুই হতে পরে না। তেমনি আল্লাহ তা'আলা আরশে ইস্তিওয়া গ্রহণ করেছেন। ইস্তিওয়া শব্দ থেকে বসা, বা উপবিষ্ট হওয়ার অর্থ গ্রহণ করে–এরূপ বলা যে, আল্লাহ তা'আলা আরশে উপবিষ্ট আছেন (নাউজু বিল্লাহ) এবং তা প্রমাণ করার জন্য বাহারি অপব্যাখ্যা আর দলিল খোঁজা ইত্যাদি সবই বক্রতার অন্তর্ভুক্ত। কারণ এসব শব্দের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না।

কারণ :

১। এরূপ বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে তা আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা যাবতীয় মুহকাম তথা স্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী।

২। আল্লাহ তা'আলার শান, সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে মুক্ত ও অমুখাপেক্ষী হওয়ারও সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

৩। সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে সলফে সালেহীন কেউ এসবের এমন অর্থ করেননি। কেউ এসবের পেছনে এভাবে দৌড়াননি। রাসূল (সা.) থেকে কোনো সাহাবী জিজ্ঞেস করেননি যে কোরআনের ইয়াদ, বাসার, সামা, ইস্তিওয়া এগুলোর কী অর্থ? কেউ জিজ্ঞেস করেননি যে আল্লাহ তা'আলা কি আরশে বসে আছেন? ইত্যাদি। তা থেকে প্রমাণিত হয় এসব নিয়ে আলোচনা করাটাই বিদ'আত। বরং পবিত্র কোরআন ও হাদীসে যেভাবে আছে সেভাবে মেনে নিয়ে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সোপর্দ করাই হলো সঠিক পথ।

এসব মুতাশাবিহাত আয়াত ও হাদীস থেকে বিভিন্ন দলিল গ্রহণ করে প্রাচীন যুগে বিভিন্ন বাতিল ফেরকা মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। তাই প্রাচীনকালে অন্তধর্মীয় এবং মুখোশধারী মুসলমানদের এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই সলফে সালেহীন এসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বর্তমান সময়ে কথিত সলফী গাইরে মুকাল্লিদরা প্রাচীন যুগের বাতিল ফিরকাগুলোর মতোই মুতাশাবিহাত আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে সে অর্থকেই মূল উদ্দেশ্য বলে মুসলমানদের মাঝে কুফরী আকীদার অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টায় লিপ্ত। তারা এর পেছনে ব্যয় করছে অগণিত অর্থ। বিশাল বিশাল প্রকাশনা গড়ে তুলছে এর পেছনে। বলছে এসবই সহীহ আকীদা। এসবের পেছনে তাদের এমন দৌড়ঝাঁপ থেকেই পবিত্র কোরআনের আয়াতের ঘোষণা মতে তারা বাতিল এবং ভ্রান্ত দল হিসেবে সাব্যস্ত হয়। কারণ যারা মুতাশাবিহাতের পেছনে দৌড়ঝাঁপ করবে পবিত্র কোরআনে তাদেরকে বক্র অন্তরবিশিষ্ট বলা হয়েছে।

আমাদের পূর্বেকার আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে কথিত লা-মাযহাবী সহীহ আকীদার নামে প্রাচীনকালের বাতিল ফিরকা বিশেষ করে কাররামিয়াদের দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদী আকীদাকেই নতুন মোড়কে প্রচার করছে। সাথে এ কথাও স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে তারা নিজেদের মুজাসসিমা বা দেহবাদী নয় বলে যতই প্রচার করুক না কেন কিন্তু তাদের আকীদার মূলই হলো এই দেহবাদী আকীদা। সুতরাং এই আকীদা ধারণের কারণে সলফে

সালেহীনগণ কাররামিয়া ফেরকাকে যেভাবে দেখেছেন, লা-মাযহাবীরাও তার ব্যতিক্রম কিছু নয়।

এখন আমরা দেখব পবিত্র কোরআন-হাদীসে যেসব বিশেষণকে অস্পষ্ট আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে সলফে সালেহীনের মতামত কী ছিল।

সিফাতে মুতাশাবিহাতের প্রকার ও বিধান :

মুতাশাবিহাত দুই প্রকার–

১। যার আভিধানিক অর্থ এবং পারিভাষিক অর্থ কিছুই জানা নেই। যেমন–পবিত্র কোরআনের মুকাত্তিআত হরুফ তথা الم، الر ইত্যাদি।

২। আভিধানিক অর্থ জানা যায় কিন্তু শরয়ী তথা পারিভাষিক অর্থ অজ্ঞাত। যেমন আল্লাহ তা'আলার 'ইয়াদ' আছে। আল্লাহ তা'আলা আরশে ইস্তিওয়া গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি।

আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে পার্থক্য

১। আভিধানিক অর্থ হলো যে শব্দ থেকে আভিধানিকগণ যে অর্থ গ্রহণ করে থাকেন।

২। পারিভাষিক অর্থ থেকে উদ্দেশ্য হলো যে ভাষাভাষীগণ যে শব্দ থেকে যে উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন। যেমন আরবী ভাষায় একটা শব্দ আছে اطول يدا লম্বা হাতবিশিষ্ট। কিন্তু ভাষা বিশেষজ্ঞগণ তা থেকে দান-দক্ষিণা ও বদান্যতার গুণও উদ্দেশ্য করে থাকেন। এটি হলো তার পারিভাষিক অর্থ। যেমন রাসূল (সা.) তাঁর স্ত্রীদের তথা উম্মুহাতুল মুসলিমীনকে বলেছেন,

اسرعكن بي لحاقا اطولكن يدا

আমার ইন্তেকালের পর সর্বপ্রথম আমার ওই স্ত্রীর ইন্তেকাল হবে, যার হাত লম্বা। (মুসলিম শরীফ ২/২৯১)

রাসূল (সা.)-এর এই কথা থেকে উদ্দেশ্য হলো হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ। কারণ তিনি খুবই বদান্য ছিলেন।

আয়াতে মুতাশাবিহাতের বিধান :

পবিত্র কোরআনের আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে, يد، وجه، عين، ساق، نفس ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে ইসলামের যে ধারণা সে অনুযায়ী উক্ত শব্দগুলোর অর্থ যা মানুষ জানে তা আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা বড়ই দুষ্কর। কারণ, يد অর্থ হাত। হাত বললেই সমস্ত মানুষের কাছে হাতের একটা চিত্র, একটা আকৃতি ভেসে আসে। সেরূপ হাতই যদি আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা হয় তবে আল্লাহ তা'আলার অন্য গুণাবলি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। যেমন পবিত্র কোরআনের আয়াত। ليس كمثله شي অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য কিছু নেই। الله الصمد আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। এখন يد، وجه ، عين ইত্যাদি শব্দ থেকে যদি আমরা হাত, চেহারা, চোখ অর্থ নিই এবং এগুলোর অর্থ আমরা যা বুঝি তাই আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করি তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ তা'আলার এমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, যা আমাদের কাছে আছে। তাতে চারটা কুফরী আকীদা সৃষ্টি হলো। ১। আল্লাহ তা'আলার দেহ আছে, ২। আল্লাহ তা'আলার আকৃতি আছে। ৩। সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্যতা। ৪। আল্লাহ তা'আলা নিজের সত্তার ক্ষেত্রে দেহ, আকৃতি এবং সাদৃশ্যতার মুখাপেক্ষী হওয়া।

কারণ : এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে মানুষ এর বাইরে কল্পনা করতে পারে না। চিন্তাও করতে পারে না। যত ওপরেই চিন্তা করুক না কেন সৃষ্টির কল্পনা ছাড়া তাদের কল্পনা আর এগোতে পারবে না। অন্যভাষায় এভাবে বলা যায়, এসব অঙ্গ সম্পর্কে মানুষ হাজার বছর চিন্তা করলেও তার চিন্তা সৃষ্টির আওতার বাইরে যেতে পারবে না। তাদের চিন্তা ও কল্পনা যত প্রকাণ্ডই হোক সৃষ্টির আওতার ভেতরেই থাকবে।

সুতরাং মানুষের জানা ও কল্পনা মতে এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে গেলেই উল্লিখিত আয়াতসহ এরূপ যাবতীয় স্পষ্ট আয়াত ও হাদীস মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। এবং আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতা প্রদান এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য দেহ আকৃতি সাব্যস্ত হয়ে যাবে। (নাউজু বিল্লাহ।)

এই জটিলতা নিরসনে সলফে সালেহীন দুটি পথ অবলম্বন করেছেন।

১। তফবীজ ২। তাবীল।

১। তাফবীজ বলা হয় এরূপ শব্দ আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে যেভাবে বলা হয়েছে তার ওপরই ঈমান আনা। অর্থাৎ এমন বিশ্বাস স্থাপন করা যে, পবিত্র কোরআন ও হাদীসে আল্লাহ তা'আলার এরূপ বিশেষণ যেভাবে বলা হয়েছে, সেভাবেই সত্য। তবে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

২। তাবীল অর্থ হলো ওই সব স্থানে সম্ভাব্য এমন ব্যাখ্যা করা, যা স্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থীও না হয় এবং আল্লাহ তা'আলার শানের প্রযোজ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য যেসব স্পষ্ট গুণাবলি বর্ণনা করেছেন সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে একটি অর্থ বের করা। বা স্পষ্ট গুণাবলি থেকে প্রযোজ্য কিছু গুণাবলি এরূপ অস্পষ্ট গুণাবলির সাথে যুক্ত করে স্বয়ং তাফবীজের দিকেই ফিরে যাওয়া।

সাধারণ মুসলমানগণ যারা দ্বীনি ইলমে পারদর্শী নন, বিশেষ করে তাঁদের জন্য এরূপ তাবীল একান্তই জরুরি। না হয় অজান্তে তাদের মধ্যে কুফরী কল্পনা জায়গা করে নেওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তাফীজ সম্পর্কে সলফে সালেহীনের ঐকমত্য

১। সলফে সালেহীনের মধ্যে মুতাকাদ্দীমীন (তথা হিজরী ৩০০ বছরের পূর্বে) ধর্ম বিশারদদের মত হলো,

التفويض مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوق

অর্থাৎ যেসব শব্দ মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত সেসব শব্দের অর্থ আমাদের জানা নেই। বরং শব্দগুলোর অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই জানেন মর্মে আকীদা রাখব।

এই ব্যাপারে আমাদের আকীদা হবে, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা যে শব্দ দিয়ে গুণটি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন সে গুণে আল্লাহ তা'আলা গুণান্বিত, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির যাবতীয় সাদৃশ্য ও আকৃতি থেকে পবিত্র।

☆ ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন–

فَمَا ذَكَرَ اللّٰهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالْعَيْنِ فَهُوَ لَه صِفَاتٌ وَلَا يُقَالُ اِنَّ يَدَه قُدْرَتُه اَوْ نِعْمَتُه لِاَنَّ فِيْه اِبْطَالَ الصِّفَةِ وَهُوَ قَوْلُ اَهْلِ الْقَدَرِ وَالْاِعْتِزَالِ وَلٰكِنْ يَدُه صِفَتُه بِلَا كَيْفٍ۔

(اَلفقه الاكبر مع الشرح ص ٣٦،٣٧)

অর্থ, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইত্যাদি যে শব্দ উল্লেখ করেছেন, সেগুলো আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত, এটা বলা যাবে না যে, আল্লাহ তা'আলার ইয়াদ অর্থ কুদরাত এবং নিয়ামত। বরং এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি বাতিল পরিগণিত হবে, যা কাদরিয়া ও মুতাযিলাদের কাজ। বরং বলতে হবে কোনো সাদৃশ্য ও আকৃতি ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার জন্য يد সাব্যস্ত।

☆ ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন,

وَالْمَذْهَبُ فِي هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الأَئِمَّةِ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَوَكِيعٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ رَوَوْا هَذِهِ الأَشْيَاءَ، ثُمَّ قَالُوا: تُرْوَى هَذِهِ الأَحَادِيثُ وَنُؤْمِنُ بِهَا، وَلَا يُقَالُ :كَيْفَ؟ وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الحَدِيثِ أَنْ يَرْوُوا هَذِهِ الأَشْيَاءَ كَمَا جَاءَتْ وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلَا تُفَسَّرُ وَلَا تُتَوَهَّمُ وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ، وَهَذَا أَمْرُ أَهْلِ العِلْمِ الَّذِي اخْتَارُوهُ وَذَهَبُوا إِلَيْهِ

ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম ইবনুল মুবারক (রহ.), ইমাম ইবনে উয়াইনা (রহ.), ইমাম ওয়াকী (রহ.)সহ অন্য ইমামগণের মাযহাব হলো, বিশেষণের ক্ষেত্রে তাঁরা এগুলো বর্ণনা করেছেন, অতঃপর বলেছেন এই হাদীসগুলো বর্ণনা করা হবে এবং আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান রাখি কিন্তু কাইফ তথা কিভাবে এই কথা বলা যাবে না। (তিরমিযী শরীফ হা. ২৫৫৭-এর অধীনে এই মতামত ব্যবস্ত করা হয়েছে)

☆ ইমাম আওজায়ী (রহ.) বলেন :

كل ما وصف الله تعالى به نفسه فى كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের কিতাবে নিজের যে সকল বিশেষণ বর্ণনা করেছেন তার পাঠই হলো তার ব্যাখ্যা এবং এর ওপর চুপ থাকতে হবে। (আল ইতিকাদ [ইমাম বায়হাকী] ৯৩ পৃ.)

☆ হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) বলেন,

ماوصف الله تبارك وتعالى به نفسه فى كتابه، قرائته تفسيره، وليس لاحد من يفسره فى العربية ولا فارسية۔

আল্লাহ তা'আলা নিজ কিতাবে নিজের যে বিশেষণ উল্লেখ করেছেন, তার পাঠই তার তাফসীর। কেউ এগুলোকে আরবী বা ফারসীতে ব্যাখ্যা করতে পারবে না। (আল আসমা ওয়াস সিফাত [বায়হাকী] ২৯৮)

☆ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশশায়বানী (রহ.) বলেন,

اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقرآن والاحاديث التى جاء بها الثقات عن رسول الله ﷺ فى صفة الرب عزوجل من غير تفسير ، ولا وصف، ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبى ﷺ وفارق الجماعة فانهم لم يصفوا ولم يفسروا بل افتوا بما فى الكتاب والسنة ثم سكتوا۔

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল ফকীহ ইমাম একমত হয়েছেন যে আল্লাহ তা'আলার গুণ ও বিশেষণ সম্পর্কিত আয়াত ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসগুলো বিশ্বাস করতে হবে, কোনোরূপ পরিবর্তন, বিশেষায়ন এবং তুলনা করা ব্যতীত। বর্তমানে যারা এগুলোর কিছু ব্যাখ্যা করছে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পথ ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করেছে এবং উম্মাহর বিরোধিতা করেছে। কারণ তারা এগুলোকে বিশেষায়িত করেনি এবং ব্যাখ্যাও করেনি। বরং তারা কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী ফতওয়া দিয়েছেন এবং নীরব থেকেছেন। (ইতিকাদু আহিলস সুন্নাহ [লালিকায়ী] ৩/৪৩৬)

☆ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর তাফবীজ এবং তাবীল :

ইমাম ইবনুল জওযী (রহ.)-এর কিতাব দাফউ শুবুহাতিত তাশবীহ গ্রন্থের টীকায় আল্লামা যাহিদ কাওসারী (রহ.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর এসংক্রান্ত বাণীগুলো উল্লেখ করেন :

لما سئل الامام احمدؒ عن احاديث النزول والروية ووضع القدم ونحوها قال: نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى،

وقال ايضا يوم سألوه عن الاستواء: استوى على العرش كيف شاء وكماشاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف، على مذكره الخلال فى السنة بسنده الى حنبل عن عمه الامام احمد وهذا تفويض وتنزيه كما هو مذهب السلف، وربما اول فى بعض المواضع كما حكى حنبل ايضاعن الامام احمد انه سمعه يقول: احتجوا على يوم المناظرة فقالوا: تجيىء يوم القيامة سورة البقرة وتجيىء سورة تبارك ، قال فقلت لهم: انما هو الثواب قال الله جل ذكره وجاء ربك والملك صفاصفا وانما تاتى قدرته، وقال ابن حزم الظاهرى فى فصله: فقد رويناعن احمد ابن حنبل رحمه الله انه قال: وجاء ربك انما معناه: جاء امر ربك۔ وهذا تأويل وتنزيه كما هو مذهب الخلف، واما ما ينقل عن الامام احمد مما يخالف ما تقدم فهو تخرص صديق جاهل وسوء فهم مذهب هذا

الامام-

"ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-কে নুযূল, রূয়াত, কাদাম রাখা ইত্যাদি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন,

نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى

আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান রাখি ও বিশ্বাস করি। কিন্তু এগুলোর কোনো স্বরূপ নেই এবং কোনো অর্থও নেই।

ইস্তিওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছা কোনো হদ বা সীমা ছাড়া ইস্তেওয়া গ্রহণ করেছেন। কোনো গুণ বর্ণনাকারী এ বিশেষণটি বর্ণনা করতে অক্ষম।

আবু বকর আল খাল্লাল তাঁর সুন্নাহ গ্রন্থে হাম্বল (রহ.)-এর সূত্রে তাঁর চাচা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

কাওসারী (রহ.) বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর বিশেষণ সম্পর্কে এ ভাষ্যগুলো তাশবীহমুক্ত তাফবীজ তথা বিশেষণের ইলম আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা অর্থে। বিশেষণ বিষয়ে সলফে সালেহীন এ পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছেন।

কখনো কখনো কোনো কোনো স্থানে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাবীল বা ব্যাখ্যাও করেছেন। যেমন হাম্বল (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, মুনাযারাতে তারা আমাকে বলেছিল, কিয়ামতের দিন সূরা বাকারা আসবে। সূরা তাবারাকা আসবে। আমি তাদের বলেছিলাম। এর অর্থ হলো সাওয়াব। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وجاء ربك والملك صفاصفا

এবং তোমাদের প্রতিপালক ও সারিবদ্ধ ফেরেশতাগণ (হাশরের ময়দানে) উপস্থিত হবেন। এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার কুদরাত আসবে।

ইবনে হাযম (রহ.) তার আলফসল গ্রন্থে বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা সংবাদ পৌঁছেছে, ইমাম আহমদ (রহ.) বলেছেন وجـــاء ربك এবং তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার আদেশ আসবে।

কাউসারী (রহ.) বলেন, ইমাম আহমদ (রহ.)-এর বক্তব্য হলো, তাশবীহমুক্ত তা'বীল বা ব্যাখ্যা। এ পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছেন উম্মাহর পরবর্তী উলামায়ে কেরাম। এই তাফবীজ ও তাবীলের বিপরীত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে যা কিছু বর্ণনা করা হয়, তা সব মূর্খ বন্ধুদের মিথ্যা সৃষ্টি বা ইমামের মাযহাব বোঝার ভুল।"

☆ আল্লামা ইবনুল জওযী (রহ.)-এর ভাষ্য :

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বোখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে হাফেজ ইবনুল জওযী থেকে বর্ণনা করেন :

قال ابن الجوزى: اكثر سلف يمتنعون من تأويل مثل هذا يشير الى حديث يضحك الله الى رجلين ويمرونه كما جاء، وينبغى ان يراعى فى مثل الامرار اعتقاد انه لاتشبه صفات الله صفات الخلق ومعنى الامرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه-

অধিকাংশ সলফে সালেহীন এ জাতীয় হাদীসের তা'বীল বা ব্যাখ্যা করতেন না। 'আল্লাহ তা'আলা দুই ব্যক্তির প্রতি জেহকের হাদীস সম্পর্কে আলোচনা' সলফে সালেহীন এসব হাদীস যেভাবে এসেছে, সেভাবেই চালিয়ে দিয়েছেন।

এ চালিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আকীদা-বিশ্বাস রাখতে হবে আল্লাহ তা'আলার বিশেষণের সৃষ্টির বিশেষণের সাথে কোনো সাদৃশ্যতা নেই।

আর সলাফের ইমরার তথা চালিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো, শব্দের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইলম না থাকা। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তানযীহ তথা সৃষ্টির বিশেষণ থেকে মুক্ত হওয়ার আকীদা-বিশ্বাস রাখা। (ফতহুল বারী ৬/৪৮)

☆ ইমাম আবু মুহাম্মদ আদী ইবনে মুসাফির আশশামী (রহ.) বলেন :

تقرير مذهب السلف كما جاء من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا حمل على الظاهر

সলফে সালেহীনের মাযহাব হলো, (আল্লাহ তা'আলার বিশেষণবিষয়ক আয়াত হাদীসসমূহ) কোনো রূপ সাদৃশ্যতা, স্বরূপ ও মিসাল ছাড়া যেমন এসেছে, তেমনই রাখা এবং এগুলোর যাহের তথা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করা। (ইতিকাদু আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামাআত, পৃ. ২৬)

☆ ইমাম ইবনুল মুনায়্যির ভাষ্য :

আল্লামা ইবনে হাজর আসকলানী (রহ.) ইমাম ইবনুল মনায়্যির (রহ.) থেকে ফতহুল বারীতে বর্ণনা করেছেন–

لاهل الكلام فى الصفات كالعين والوجه واليد ثلاث اقوال--- والثالث امرارها على ماجاء ت معناها الى الله تعالى

আইন, ইয়াদ, ওজহুন ইত্যাদি বিশেষণ বিষয়ে তিনটি মতামত রয়েছে... এর তৃতীয়টি হলো, এসব বিশেষণ যেভাবে এসেছে, সেভাবেই চালিয়ে দেওয়া এবং এ গুণগুলোর অর্থ আল্লাহ তা'আলার ওপর তাফবীজ তথা সোপর্দ করা। (ফতহুল বারী ১৩/১৯০)

এরপর ইবনে হাজর (রহ.) লেখেন,

قال الطيبى هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف

আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, এটা হলো গ্রহণযোগ্য মতামত। সলফে সালেহীন এ পথ ও পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন।

☆ ইমাম নববী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মজমু'তে লেখেন,

اختلفوا فى آيات الصافت واخبارها هل يخاض فيها بالتاويل ام لا؟ فقال قائلون تتاول على ما يليق بها، وهذا اشهر المذهبين للمتكلمين، وقال آخرون لا تتاول بل يمسك عن الكلام فى معناها ويوكل علمها الى الله تعالى ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات

তা'আলার আরশে) ইস্তেকরার তথা স্থিতিকে অস্বীকার করেছেন।

☆ **হাম্বলী মাযহাবের ইমাম আল্লামা আব্দুর রহমান আল জাওযী (রহ.)** তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ দাফউশ শুবহাতিত তাশবীহ গ্রন্থে বলেন,

ورأيت من اصحابنا من تكلم فى الاصول بما لا يصلح، وانتدب للتصنيف ثلاثة: ابو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضى ابو يعلى وابن الزاغونى فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب، ورأيتهم قد نزلوا الى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس، فسمعوا ان الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه الصلوة والسلام على صورته فاثبتوا له صورة وجها زائدا على الذات وعينين، وفما، ولهوات، واضراسا، اضواء، لوجهه هى السبحات ، ويدين، واصابع، وكفا، وخنصرا، وابهاما، وصدرا، وفخذا، وساقين، ورجلين، وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس۔

وقالوا يجوز ان يمس ويمس ويدنى العبد من ذاته، وقال بعضهم : ويتنفس ثم انهم يرضون العوام بقولهم (لا كما يعقل)

وقد اخذوا بالظاهر فى الاسماء والصفات فسموها بالصفات تسمية متبدعة لا دليل لهم فى ذلك من النقل ولا من العقل ، ولم يلتفتوا الى النصوص الصارفة عن الظواهر الى المعانى الواجبة لله تعالى ولا الى الغاء ما توجيه الظواهر من سمات الحديث۔

আমি আমাদের মাযহাবের (হাম্বলী মাযহাবের) অনুসারী কারো কারো (দ্বীনের) মৌলিক বিষয়ে এমন কিছু কথা বলতে শুনেছি, যা সঠিক নয়। তিনজন তো এর ওপর কিতাবও লিখেছেন। তাঁরা হলেন আবু আব্দুল্লাহ ইবনে হামেদ, তাঁর ছাত্র কাজী আবু ইয়ালা মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন এবং আবুল হাসান ইবনে ঝাগুনী। তাঁরা এমন সব কিতাব লিখেছেন, যার দ্বারা মাযহাবের দুর্নাম ও বদনাম হয়েছে।

তুমি তাঁদের দেখতে পাবে তাঁরা সাধারণ

الحديث على الايمان وتفويض معناها المراد الى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له تعالى عن حقيقتها

অধিকাংশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, যাঁদের মধ্যে সলফে সালেহীন ও মুহাদ্দিসীন রয়েছেন (এখানে আহলুল হাদীস অর্থ মুহাদ্দিসীনে কেরামই উদ্দেশ্য। বর্তমান যুগের কথিত আহলে হাদীস উদ্দেশ্য নয়), অর্থাৎ অধিকাংশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের আকীদা-বিশ্বাস হলো, মুতাশাবিহাতের ওপর ঈমান আনতে হবে হবে এবং এর উদ্দেশিত অর্থকে আল্লাহ তা'আলার ওপর তাফবীয তথা সোপর্দ করতে হবে। আমরা মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতে আল্লাহ তা'আলার তানযীহ তথা পবিত্রতার আকীদার জন্য এগুলোর ব্যাখ্যা করব না। (আল ইতকান ২/১০)

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো, সলফে সালেহীনদের পদ্ধতি ছিল বিশেষণের বেলায় তার উদ্দেশ্য আল্লাহর প্রতিই সোপর্দ করা।

এসবের বাহ্যিক অর্থকে আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত না করা। এতদসম্পর্কে সলফে সালেহীনের আরো মতামত নিম্নরূপ :

মুতাশাবিহাতের বাহ্যিক অর্থকে উদ্দেশ্য বানানো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিয়ম ও পদ্ধতি নয় :

☆ **ইমাম গাজালী (রহ.)** বলেন,

قد تحزب الناس فيه فضل فريق واجروه على الظاهر، وتبعهم آخرون اذ ترددوا فيه ان لم يجزموا وفازمن قطع بنفى الاستقرار۔

আল্লাহ তা'আলার বিশেষণ বিষয়ে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। এক দল তো গোমরাহ হয়েছে এভাবে যে, তারা বিশেষণের বাহ্যিকতাকে গ্রহণ করেছে। অপর দল তাদের অনুসরণ করেছে যদিও তারা এ বিষয়ে সন্দিহান এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত প্রদান করেনি। সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাঁরাই যাঁরা (আল্লাহ

الحوادث عنه، فيقال مثلا: نؤمن بان الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمرادبه، مع انا نعتقد ان الله تعالى ليس كمثله شئ، وانه منزه عن الحلول وسمات الحدوث وهذه طريقة السلف او جماهيرهم وهى اسلم

বিশেষণবিষয়ক আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে তাবীল বা ব্যাখ্যা করা হবে কি না, এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম ইখতিলাফ করেছেন। এক জামাত উলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহর শানে প্রযোজ্য হয়-এভাবে তাবীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে। এটা মুতাকাল্লিমীনদের প্রসিদ্ধ মাযহাব।

উলামাগণের অপর জামাত বলেন, তাবীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং এগুলোর অর্থ সম্পর্কেও কোনো কথা বলা যাবে না বরং এর ইলমকে আল্লাহ তা'আলার ওপর সোপর্দ করতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার তানযীহ তথা মাখলুকের সাথে সাদৃশ্যতা থেকে পূতঃপবিত্র হওয়ার আকীদা রাখতে হবে এবং আকীদা রাখতে হবে তাঁর সিফাত তথা বিশেষণগুলো অবিনশ্বর। উদাহরণস্বরূপ : الرحمن على العرش استوى সম্পর্কে বলা হবে, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ তা'আলা আরশে ইস্তিওয়া গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমরা এ ইস্তিওয়ার প্রকৃত অর্থ জানি না এবং এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য তাও আমরা জানি না। সাথে সাথে আমরা আকীদা-বিশ্বাস রাখি কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলার ন্যায় নয়। তিনি হুলুল তথা কোনো কিছুতে প্রবিষ্ট হওয়ার ও ধ্বংসশীল হওয়ার চিহ্ন থেকে পবিত্র।

বিশেষণ বিষয়ে অধিকাংশ সলফে সালেহীন এ পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। সিফাত তথা বিশেষণ বিষয়ে এ পথ ও পদ্ধতিই নিরাপদ। (আল মুজমু' ১/২৫)

☆ **আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)** বলেন,

وجمهور اهل السنة منهم السلف واهل

আওয়ামদের কাতারে নেমে গেছেন। তাঁরা সিফাতকে হিস তথা অনুভূতিমূলকভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁরা শুনেছেন আল্লাহ হযরত আদম (আ.)-কে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। ব্যস, এটা শুনেই তাঁরা আল্লাহ তা'আলার জন্য দুই চোখ, মুখ, আলা জিহ্বা, মাড়ির দাঁত, উজ্জ্বলতা, মুখের তাসবীহ, দুই হাত, আঙুল, হাতের তালু, কনিষ্ঠাঙ্গুলি, বৃদ্ধাঙ্গুলি, বক্ষ, উরু, পায়ের দুই নলা, দুই পা ইত্যাদি সাব্যস্ত করেছেন। আর তাঁরা বলেছেন আমরা আল্লাহ তা'আলার মাথার কথা শুনিনি।

তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এ কথাও বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা স্পর্শ করার মতো এবং তাঁকে স্পর্শ করা যায়, বান্দা আল্লাহর সত্তার নিকটবর্তী হতে পারেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা শ্বাস গ্রহণ করেন। আর আওয়াম তথা সাধারণ ব্যক্তিরা তাঁদের কথা لاكما يعقل এটা 'এমন যা বোঝা যায় না' দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে থাকে।

তাঁরা আসমাউস সিফাত তথা বিশেষণের ক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছে এবং বিশেষণের এমন বিদ'আতী নামকরণ করেছেন যার পক্ষে কোরআন-সুন্নাহ বা আকলের কোনো দলিল তাঁদের কাছে নেই। তাঁরা কোরআন-সুন্নাহের ওই সব বাণীর প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেননি, যে বাণীগুলো বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ বাতিল প্রমাণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য অর্থকে গ্রহণ করতে আবশ্যক করে দেয় এবং তাঁরা ভ্রূক্ষেপ করেননি হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে যা আবশ্যক হয়, তা বাতিল করার প্রতিও।

অর্থাৎ এসব হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা হলে আল্লাহ তা'আলার জন্য জিসিম তথা শরীর-অঙ্গ প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক হয়। যার থেকে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণই পবিত্র।

আল্লাহ তা'আলার জন্য এসব জিসিম ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্তকারীদের সম্পর্কে একটু এগিয়ে ইমাম জাওযী (রহ.) বলেন,

ويقولون نحن اهل السنة وكلامهم صريح فى التشبيه۔

তারা আবার বলে, আমরা আহলুস সুন্নাহ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী। অথচ তাদের কথাগুলো স্পষ্ট সাদৃশ্যবাদীদের কথা। (যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী আকীদা)। (আকীদা ও ইলমুল কালাম, পৃ. ২৩২)

☆ **ইমাম আবু মাহাম্মদ আদী ইবনে মুসাফির আশশামী (রহ.)** বলেন,

تقرير مذهب السلف كما جاء من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا حمل على الظاهر

সলফে সালেহীনের মাযহাব হলো, বিশেষণ বিষয়ে কোনো রূপ সাদৃশ্যতা, স্বরূপ ও উপমা ব্যতীত যেমন এসেছে, তেমনই রাখা এবং বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করা। (সিয়ারু আলামিন নুবালা ২০/৩৪২)

☆ **ইমান নববী (রহ.)**-এর বক্তব্য :

امساك السماوات على اصبع والارضين على اصبع

হাদীসের আলোচনায় ইমাম নববী (রহ.) লেখেন,

هذا من احاديث الصفات، وقد سبق فيها المذهبان، التأويل والامساك عنه مع الايمان بها ومع اعتقاد ان الظاهر منها غير مراد۔

এগুলো বিশেষণবিষয়ক হাদীস। পূর্বে আলোচনা হয়েছে এ প্রকার হাদীসে দুটি পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। এক. তাবীল বা ব্যাখ্যা। দুই. এগুলোর প্রতি ঈমান রেখে চুপ থাকা। সাথে সাথে এ বিশ্বাস রাখা বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

☆ **ইমাম শাতবী (রহ.)** তাঁর কিতাব আল ইতিসাম এ বিদ'আতীদের মূলনীতি উল্লেখ করে দৃষ্টান্ত প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

ومثاله فى ملة الاسلام مذهب الظاهرية فى اثبات الجوارح للرب، المنزه عن النقائض من العين واليد والرجل والوجه المحسوسات والجهة وغيره ذلك من الثابت للمحدثات۔

ইসলাম ধর্মে এর দৃষ্টান্ত হলো, যাহিরিয়্যা ফিরকা তথা বাহ্যিকবাদীরা। তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য (সৃষ্টির মতো) চোখ, হাত, পা, চেহারা ইত্যাদি পঞ্চইন্দ্রিয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করে এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য দিকসহ অন্যান্য ধ্বংসশীল বিষয় সাব্যস্ত করে। (আল ইতিসাম ১/২৩৯)

☆ **আল্লামা ইবনে হাজর আসকলানী (রহ.)** বলেন,

قد اختلف فى معنى النزول على اقوال فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم ومنهم من انكر صحة الاحاديث الواردة فى ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة والعجب انهم اولون مافى القرآن من نحو ذلك وانكرو ما فى الحديث اما جهلا واما عنادا ومنهم اجراه على ماورد مؤمنا به على طريق الاجمال منزها الله تعالى عن الكيف والتشبيه وهم جمهور السلف۔

হাদীসের মধ্যে যে নুযুল শব্দ রয়েছে, এর অর্থের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম ইখতিলাফ করেছেন। কেউ বলেন, এটাকে জাহেরী অর্থে তথা বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। এরা হলো, মুশাব্বিহা ফিরকা। এদের এ জাতীয় মতামত থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। অপর দল রয়েছে যারা এ জাতীয় হাদীসের বিশুদ্ধতা অস্বীকার করে। এরা হলো খারেজী, মুতাযিলা ফিরকা। এরা সীমা লঙ্ঘন করে থাকে। এদের বিষয়ে আশ্চর্য হতে হয়, এরা কোরআনে কারীমের বর্ণিত বিশেষণ বিষয়ে ব্যাখ্যা করে। আর হাদীসের বিশেষণ বিষয়ে যা এসেছে তা অস্বীকার করে। তারা এটা করে হয় মূর্খতাবশত অথবা সীমালঙ্ঘনবশত। উলামাদের অপর দল কোরআন-সুন্নাহতে বিশেষণ বিষয়ে যা এসেছে সেগুলোর প্রতি এজমালিভাবে

ঈমান রাখেন এবং যেভাবে এসেছে সেভাবেই চালিয়ে দেন। সাথে সাথে তাঁরা সৃষ্টির সাথে স্বরূপ, তুলনা ও সাদৃশ্যতা থেকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করেন। তাঁরা হলেন অধিকাংশ সলফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারগণ। (ফতহুল বারী ৩/৩০)

এই বক্তব্যে হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বাহ্যিক অর্থ গ্রহণকারীদের স্পষ্ট মুশাব্বিহা তথা সাদৃশ্যবাদী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

☆ **হাফেজ বদরুদ্দীন ইবনে মাজাহ (রহ.)** বলেন,

ومن انتحل قول السلف وقال بتشبيه او تكييف او حمل اللفظ على ظاهره مما يتعالى الله عنه من صفات المحدثين فهو كاذب فى انتحاله، برئ من قول السلف واعتداله

যারা সলফে সালেহীনগণের আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণের দাবি করে তাশবীহ তথা দেহবাদী আকীদার কথা বা তাকয়ীফ তথা স্বরূপ ও প্রকৃতির কথা বলে, অথবা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি গুণাগুণ থেকে বহু উর্ধ্বে হওয়ার পরও (সিফাতে মুতাশাবিহার) শব্দগুলো থেকে তার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের কথা বলে এরা হলো মিথ্যাবাদী। সলফে সালেহীনের আকীদা-বিশ্বাস ও মধ্যপন্থা অবলম্বনের সাথে এদের কোনোই সম্পর্ক নেই। (ঈযাহুদ দলীল ফী কাতয়ী হুজাজি আহলিত তা'তীল, পৃ. ৯৩)

☆ **আল্লামা শাহরাস্তানী (রহ.)** বলেন,

ثم ان جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف، فقالوا لا بد من اجرائها على ظاهرها، فوقعوا فى التشبيه الصرف، وذلك على خلاف ما اعتقده السلف

পরবর্তীরা সলফে সালেহীনের আকীদা-বিশ্বাসের ওপর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের অতিরিক্ত দাবি করেছেন। আর এ দাবি করে তাঁরা সুস্পষ্ট তাশবীহ তথা দেহবাদী আকীদাতে নিপতিত হয়েছেন। বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের এ দাবি সলফে সালেহীনের আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত। (আল মিলাল ওয়ান নিহাল ১/৯৩, বাংলা ভাষায় এসব বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য সুন্নাহ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান কিতাবটি পড়া যায়)

সলফে সালেহীন বনাম লা-মাযহাবীদের আকীদা :

উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হলো যে, সলফে সালেহীনদের অধিকাংশই সিফাতে মুতাশাবিহা তথা কোরআন-হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তা'আল্লাহ তা'আলার অস্পষ্ট বিশেষণগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তাফবীজকেই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এসব বিশেষণের মূল অর্থ ও উদ্দেশ্য কী তা আল্লাহ তা'আলার প্রতিই সোপর্দ করেছেন। কেউ এসবের বাহ্যিক অর্থকে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেননি।

কথিত সালাফী লা-মাযহাবীরা বলে থাকে, এসবের বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য। তবে বেলা কায়ফ। অর্থাৎ স্বরূপ প্রদান ব্যতীত ওসবের বাহ্যিক অর্থটিই আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য। এসব মূলত কোনো বস্তুর গভীরতা সম্পর্কে না বোঝারই নামান্তর। কোনো বস্তুর অর্থ গ্রহণ করা এবং তাই উদ্দেশ্য বলা মানেই হলো তার স্বরূপ বলে দেওয়া এবং সাদৃশ্যতা ও আকৃতি প্রদান। যেমন আল্লাহ তা'আলার জন্য 'ইয়াদ' শব্দটি সাব্যস্ত। কিন্তু আমি যদি বলি ইয়াদ অর্থ আমরা যে হাত বুঝি সেটাই। এবং সেটাই আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত। তাহলে এখানে আবার বেলাকায়ফ শব্দ যোগ করার কী অর্থ হতে পারে? কারণ মানুষ হাত বলতে যেটা বুঝে সেটা স্বরূপ ও আকৃতি ছাড়া হতে পারে না। যদি তা আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত হয় তবে সেটাই তো স্বরূপ। মানুষ তো এমন হাতের কথা কল্পনাও করতে পারে না, যেটা কোনো আকৃতি বা সাদৃশ্যতা ছাড়াই হবে।

সলফে সালেহীনগণ যেখানে বেলা কায়ফ শব্দ বলেছেন সেখানে অনেকে বেলা মা'নাও বলেছেন। তাহলে বোঝা যায় তাঁদের উদ্দেশ্য হলো এর অর্থ যেটা মানুষ জানে, সেটা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না। বরং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই জানেন। যাঁরা উভয় শব্দ বলেছেন তাঁদের বেলায় বলা হবে, বেলা কায়ফ শব্দটি তাতে তাকীদের জন্য বলা হয়েছে।

লা-মাযহাবীদের প্রতারণাটা এখানেই। সলফে সালেহীনের উদ্দেশ্য হলো, এসব আয়াত ও হাদীসের অর্থ যেটা মানুষ বোঝে সেটা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য কী তা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাঁর ওপর সোপর্দ করাই মূল আকীদা। আর লা-মাযহাবীরা বলে থাকে বাহ্যিক অর্থই মূল উদ্দেশ্য তবে বেলাকায়ফ তথা স্বরূপ ব্যতীত।

তাতে বোঝা যায়, সালাফের কথার মর্ম হলো বেলাকায়ফ ওয়া বেলা মা'না আল্লাহর দিকে তাফবীজ করা। অথবা বেলা কায়ফ অর্থ হলো বেলা মা'না আল্লাহর দিকে তাফবীজ করা। অর্থাৎ কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করা ছাড়াই তা আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করা। তাদের কাছে এই ব্যাপারে বাহ্যিক অর্থও উদ্দেশ্য নয় মর্মে মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

সলফ এবং লা-মাযহাবীদের মধ্যে আসমান-জমিনের এই পার্থক্য থাকার পরও তারা বলে তাদের দেওয়া মর্মই সহীহ আকীদা এবং সলফে সালেহীনের আকীদা।

পূর্বে আমরা লা-মাযহাবীদের যে আকীদা তুলে ধরেছি তা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য এবং সলফে সালেহীনের মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্টভাবেই উদ্ভাসিত হয়। কারণ তাতে প্রমাণ করা হয়েছে মূলত লা-মাযহাবীরা মুজাসসিমা ও মুশাব্বিহা তথা দেহ ও সাদৃশ্যবাদী আকীদাকেই নতুন মোড়কে প্রচার করছে, যা সলফে সালেহীনের ভাষ্যমতে সম্পূর্ণ কুফরী এবং শিরকী আকীদা।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)